চিত্রা দেব

বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন

বুদ্ধদেব নিজের ছবি আঁকা কিংবা মূর্তি গড়া পছন্দ করতেন না। বলতেন 'যে দেহ নশ্বর, দুদিন পরে ধুলোয় মিশে যাবে তাকে ধরে রেখে কি হবে।'

তাঁর উপদেশ মনে রেখে তাঁর শিষ্যরা কেউ তাঁর মূর্তি গড়েনি, ছবিও আঁকেনি। কেটে গেল অনেকদিন। তারপর হাজার হাজার মানুষ 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' বলতে বলতে যেদিন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করলো, সেদিন সবার মনে হতে লাগলো, কেমন দেখতে ছিলেন বুদ্ধদেব ? কাকে সামনে রেখে এগিয়ে যাবেন তাঁরা ?

শুরু হল বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়া আর ছবি আঁকার কাজ। রাজারা অজস্র অর্থ দিলেন, প্রজারা দিলেন অর্ঘ্য। দেশ-বিদেশ থেকে বড় বড় শিল্পী এলেন, এলেন ভাস্কর। কিভাবে বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়া হল আর ছবি আঁকা হল, কিভাবে জানা গেল বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন, হাজার বছর ধরে ভাঙাগড়ার সেই ইতিহাস গল্পের মতো সরস ভঙ্গিতে, বুদ্ধদেবের জীবনকথা ও বৌদ্ধধর্ম প্রসারের কাহিনীর সঙ্গে শুনিয়েছেন চিত্রা দেব। সঙ্গে আছে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধতীর্থগুলির নাম ও কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য ছবি।

ISBN 81-7066-082-3

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by B Jyoti Bhante

বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন

চিত্রা দেব

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

প্রথম সংস্করণ ২৫ বৈশাখ ১৩৯৪ মুদ্রণ সংখ্যা ২২০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

ISBN 81-7066-082-3

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ২৫·০০

ভূমিকা

বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। হাজার বছর ধরে তাঁর রূপ কল্পনা করা হয়েছে। এখনও এক এক দেশে এক এক রকম বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়ে। আমরা সবাই তাঁকে দেবতার আসনে বসিয়েছি। আড়াই হাজার বছর আগেকার গৃহত্যাগী সাধক শাক্যরাজপুত্র আজ আরাধ্য দেবতার সমতুল্য দেবোপম মহামানব।

দেবতার রূপ আমরা কল্পনা করে নিই। এবং সবসময়েই ভাবি তিনি মানুষের মতো দেখতে। স্বামীজী বলেছিলেন, একটা মহিষ যদি মনে মনে ঈশ্বরের রূপ কল্পনা করে তাহলে সে ভাববে ঈশ্বরকে দেখতে মহিষের মতো।

দেবতার মতো দেবোপম মানবের রূপও কল্পনা করা হয়। বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট, মহাবীর, চৈতন্যদেব এঁদের সবার রূপই কাল্পনিক। এঁদের যে সব ছবি আমরা দেখি সবই আমাদের মনগড়া। আমরা ভাবি তিনি আমাদের মতো দেখতে, চীনারা ভাবে তাদের মতো। সেইজন্যে ভারতের বুদ্ধদেব ভারতীয়দের মতো দেখতে। চীনাদের বুদ্ধমূর্তি অনেকটা তাদের মতো। তবু বুদ্ধমূর্তি গড়ার একটা স্বতন্ত্র ইতিহাস আছে,কারণ বুদ্ধদেব স্বয়ং মূর্তি নির্মাণ বা ছবি আঁকার বিরোধী ছিলেন। তাই একটু একটু করে স্তূপ, পদচিহ্ন, প্রতীক ও মূর্তি নির্মাণের মধ্যে ছিল অনেক সংশয়, অনেক চিন্তা,অনেক পরিকল্পনা। ভারতে বৌদ্ধধর্ম এসেছিল প্লাবনের মতো। ছড়িয়ে পড়েছিল সমস্ত এশিয়া মহাদেশে। সেই উন্মাদনা ও আকুলতা আর কোন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। এঁদের আগ্রহ ও উৎসাহই বুদ্ধদেবের অসংখ্য রূপ দিয়েছে এবং শেষে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে খুঁজে পেয়েছে প্রকৃত সত্যকে। পুঞ্জীভূত শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে গড়েছে সত্যিকারের বুদ্ধদেবের মূর্তি। এঁকেছে তাঁর ছবি। এই রূপকল্পনাকে মিথ্যে ভাবার কোন কারণ নেই। আমরা জানি পুলিশের দক্ষ চিত্রকর বর্ণনা শুনে যখন কোন মানুষের ছবি আঁকে তখন তা বাস্তবের খুব কাছাকাছি হয়। আর হাজার বছর ধরে একটু একটু করে রূপ দেওয়া মূর্তি ও ছবিই বা সত্যি হবে না কেন ? আর কারোর মূর্তি নির্মাণের জন্য তো এত চেষ্টা হয়নি।

চিত্রা দেব

বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন বলো তো ? জানি তোমরা সবাই বলতে পারবে। হয়তো ইতিহাসের পাতা খুলে দেখিয়েও দেবে তাঁর ছবি। পদ্মাসনে বসা ধ্যানমূর্তি, মাথায় চুড়ো করা খোঁপার মতো জটা, কোলের ওপরে হাত দুটি, মুখখানি শান্ত, ঠোঁটে সামান্য হাসি, চোখ বুজে যেন ধ্যানে বসেছেন। ও কি কেউ ভুলতে পারে নাকি? মজার কথা কি জানো ? আসলে বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন কেউ তা জানে না। যাঁরা বুদ্ধদেবের ছবি এঁকেছিলেন তাঁরাও না, যাঁরা বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়েছিলেন তাঁরাও না। সবই আমাদের মনগড়া ধারণা। আর একটু খুলেই বলা যাক না হয়।

বুদ্ধদেবের জন্ম হয়েছিল আনুমানিক খ্রীস্টপূর্ব ৫৬৬ বছরে, অর্থাৎ বয়সে তিনি যীশুখ্রীস্টের চেয়ে প্রায় ৬০০ বছরের বড়ো ছিলেন। শোনা যায়, বুদ্ধদেব বা গৌতম বুদ্ধের আগেও অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের গল্প আছে জাতকে। বুদ্ধদেব নিজেই তাঁর শিষ্যদের কাছে শুনিয়েছিলেন নিজের পূর্বজন্মের কথা। এই পর্যায়ে তাঁর নাম ছিল বোধিসত্ত্ব। তাঁর কথায় পরে আসা যাবে। এখন গৌতম বুদ্ধের কথাই বলি। তাঁর কথা খুলে না বললে বুঝতে পারবে না কেন তাঁর মূর্তি ও ছবি নিয়ে এত জল্পনা-কল্পনা হল।

কপিলাবস্তুর রাজা ছিলেন শুদ্ধোদন। রাজার একটাই দুঃখ তাঁর সব আছে হাতি আছে, ঘোড়া আছে, ধন আছে, ঐশ্বর্য আছে, সৈন্য আছে, সেপাই আছে, প্রজা আছে, সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি সব আছে শুধু ছেলে নেই। রাজপুত্র নেই, কে রাজা হবে ? অনেক পুজো আর্চা দানধ্যানের পরে রাজার এক ছেলে জন্মালো। তাঁর জন্মের আগে রানী মায়াদেবী স্বপ্নে দেখলেন একটা বিশাল হাতিকে। জ্যোতিষীরা বললেন হাতির স্বপ্ন দেখা ভালো, রাজার ঘর আলো করে রাজপুত্র আসবেন। এলেনও। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন লুম্বিনী উদ্যানে তাঁর জন্ম হল। তিনিই গৌতম বুদ্ধ। প্রথম জীবনে তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। নামটার অর্থ বোধহয় তোমরা জানো। তিনি জন্মগ্রহণ করায় বাবা মার মনস্কামনা সিদ্ধ হল বলে তাঁর নাম রাখা হল সিদ্ধার্থ। তারই পরে একটা দুর্ঘটনা ঘটলো। কয়েকদিন পরে মায়াদেবী মারা গেলেন। সিদ্ধার্থকে কোলে তুলে নিলেন তাঁর বিমাতা মহাপ্রজাবতী গৌতমী। গৌতমীর পুত্র বলে সিদ্ধার্থর আরেকটা নাম হল গৌতম।

সিদ্ধার্থর ভবিষ্যৎ গণনা করবার জন্যে শুদ্ধোদন রাজ্যের বড়ো বড়ো

জ্যোতিষীদের ডাকলেন। তাঁরা অনেক পাঁজি পুঁথি দেখে, অঙ্ক কষে, খড়ি পেতে, আঁকিবুঁকি কেটে বললেন, 'ইনি সংসারে থাকলে বড়ো রাজা হবেন আর সংসার ত্যাগ করলে বড়ো সাধু হবেন।' সে কী ? রাজপুত্র সাধু হয়ে গেলে রাজ্যশাসন করবে কে ? রাজা জানতে চাইলেন কী করে সিদ্ধার্থর সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছেকে ভুলিয়ে রাখা যায় ? জ্যোতিষীরা বললেন, দুঃখের যত কারণ আছে রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, মৃত্যুর সঙ্গে যদি সিদ্ধার্থর পরিচয় না হয় তাহলে ভয় নেই। তা কি করে হবে ? দুঃখ সব জায়গাতেই আছে। সবাই বুড়ো হয়, রোগে ভোগে আবার মারাও যায়। রাজ্যে বহু লোক আছে তাদের কেউ বৃদ্ধ, কেউ অসুস্থ আবার অনেকেই মারা পড়ে। তবু শুদ্ধোদন কড়া পাহারা বসালেন। সিদ্ধার্থর সামনে যেন এরা কেউ না আসে তার ব্যবস্থাও করলেন। সিদ্ধার্থ রাজার বাড়িতে বসেই পণ্ডিতের কাছে শাস্ত্র পড়েন, অস্ত্র শিক্ষা করেন। তাঁর মধুর স্বভাবের জন্যে সকলেই তাঁকে ভালবাসেন। সিদ্ধার্থও ভালবাসেন সবাইকে।

একদিন তিনি বাগানে বসে আছেন এমন সময় তাঁর কাকার ছেলে দেবদত্ত একটা পাখিকে তীর মেরে আকাশ থেকে মাটিতে ফেলে দিলেন। ছটফট করতে করতে পাখিটা ঝপ করে পড়লো সিদ্ধার্থের সামনে। তিনি তাকে কোলে তুলে তীরটা খুলে ফেললেন তার ডানা থেকে। তাঁর সেবায় পাখিটা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে এমন সময় পাখি খুঁজতে খুঁজতে এলেন দেবদত্ত। এসেই বললেন, 'আমি তীর মেরেছি কাজেই পাখি আমার, আমাকে দাও।' সিদ্ধার্থ দিলেন না। বললেন, 'আমি সেবা করে বাঁচিয়েছি কাজেই পাখি আমার।' দুজনের মধ্যে খুব ঝগড়া হল, শেষে মধ্যস্থ হিসেবে তাঁরা রাজপুরোহিতের কাছে এলেন। সব শুনে পুরোহিত বললেন, পাখি সিদ্ধার্থ পাবেন। দেবদত্ত তাকে মেরেছেন আর সিদ্ধার্থ তাকে বাঁচিয়েছেন কাজেই সিদ্ধার্থের অধিকার বেশি। এভাবেই সিদ্ধার্থের মধ্যে দয়া ও করুণার ভাবগুলো ফুটে উঠতে লাগলো। মানুষের দুঃখ দেখে পরে যাঁর হৃদয় কেঁদে উঠবে, পাখির কষ্ট তিনি দেখবেন কি করে ?

আঠারো বছর বয়স হলে সিদ্ধার্থর বিয়ে হল খুব ধুমধামের সঙ্গে। তাঁর স্ত্রীর নামটি ঠিক ঠিক কেউ জানে না। কেউ বলে যশোধরা, কেউ বলে গোপা, কেউ বলে ভদ্রা। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁকে বলা হয় রাহুল জননী অর্থাৎ রাহুলের মা। আরো দশটা বছর কেটে গেল। তারপর একদিন আর প্রাসাদে বন্দী হয়ে বসে থাকতে ভালো লাগলো না। বাবার অনুমতি নিয়ে সিদ্ধার্থ বেরোলেন রথে চড়ে। পথের পাশে দেখেন একজন রুগ্ন মানুষ, বড্ড কষ্ট পাচ্ছে। দেখেই তাঁর মন খারাপ হয়ে গেল। এরপর একদিন পথে বেরিয়ে দেখলেন এক বৃদ্ধকে। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়ে চলেছে, চলতে যেন আর পারে না। সিদ্ধার্থ সারথিকে জিজ্ঞেস করলেন,

'ওর কি হয়েছে ?' সারথি বললে, 'ও কিছু নয় যুবরাজ, জরা ওর শক্তিকে ক্ষয় করেছে। সব মানুষেরই একদিন এই অবস্থা হবে।' এরপর সিদ্ধার্থ দেখলেন একটা মৃতদেহ। ভাবনায় চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠলেন তিনি। এত আদর যত্নে যে দেহকে মানুষ রক্ষা করে সেই দেহের এই পরিণাম ? তাঁর সারথি বললেন, 'হ্যাঁ যুবরাজ। মানবদেহের এই নিয়ম। জন্মালেই কষ্ট পেতে হবে। সকলেরই রোগ হবে, সকলেরই বয়স বাড়বে, সকলেই মারা যাবে। এর কোন নড়চড় হবার উপায় নেই।'

ভাবনার মধ্যে ডুবে গেলেন সিদ্ধার্থ। চারপাশের রাজভোগ আর বিলাসিতাকে পানসে মনে হতে লাগলো। এত কষ্ট যখন পেতেই হবে তখন এত ভালো খেয়ে-পরে লাভ কি ? সব মানুষের দিকে ভালো করে তাকান আর দেখেন দুঃখের ভারে সবাই যেন নুয়ে পড়ছে। ভাবতে ভাবতে দিন যায়। একদিন একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হল। সিদ্ধার্থ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে ?'

সাধু হেসে বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী। আমি মুক্তির জন্যে গৃহত্যাগ করেছি।'

সন্ন্যাসী চলে গেলে সিদ্ধার্থ আবার ভাবতে বসলেন। এতদিনে তাঁর মনে হল একটা রাস্তা পাওয়া গেছে। ঠিক করলেন, তিনিও সংসার ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে বেরোবেন। বাবাকে মানে রাজা শুদ্ধোদনকে প্রণাম করে বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন আমি মোক্ষের জন্যে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করব।'

রাজা তো হায় হায় করে উঠলেন। বললেন, 'এখনি এ বুদ্ধি ত্যাগ কর।' সিদ্ধার্থ বললেন, 'যদি আপনি আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে, জরার হাত থেকে, রোগের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন তাহলে আমি সন্ন্যাসী হব না।' তা কি করে হয় ? শুদ্ধোদন এ প্রার্থনা কি করে পূর্ণ করবেন ? এ যে মানুষের অসাধ্য। তিনি অনেক চোখের জল ফেলে ছেলেকে বোঝাতে বসলেন, ওদিকে প্রাসাদের প্রহরীর সংখ্যাও বাড়িয়ে দেওয়া হল।

তবু সিদ্ধার্থকে বেঁধে রাখা গেল না। রাত্রিবেলা একটা দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে তিনি রাজ্য ছেড়ে, পিতাকে ছেড়ে, স্ত্রী-পুত্রকে ছেড়ে চলে গেলেন। তখন তাঁর বয়স ঊনত্রিশ বছর। কপিলাবস্তু থেকে বৈশালীতে, সেখান থেকে শ্রাবস্তীতে তারপর নিরাজনা নদীর ধারে উরুবিল্ব বা গয়ায়। শোনা যায়, গৌতম বৈশালীতে গিয়ে প্রথমে এক ব্রাহ্মণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নাম আলার, কালাম গোত্রে তাঁর জন্ম। তিনি তাঁকে ধ্যান করার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন। ধ্যান কাকে বলে তোমরা বোধহয় জানো। ধ্যান হল কোন এক জিনিসকে এক মনে চিন্তা করা। ধর তুমি ধ্যানে বসবে। কার ধ্যান করবে ? হিন্দুরা আপন আপন

ইষ্টদেবকে ধ্যান করে। কেউ ধ্যান করে মা কালীর কেউ-বা কেষ্ট ঠাকুরের চোখ বুজে একমনে তাঁর কথা ভাবতে ভাবতে মনে হয় ঠাকুর যেন সত্যিই সামনে বসে আছেন। এভাবে অনেকে মহাপুরুষদেরও ধ্যান করে। কেউ ধ্যান করে বুদ্ধদেবের, কেউ মহাবীরের কেউ-বা ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের। ধ্যান করলে কি হয় ? নিজের মনকে খুব শান্ত করে চিন্তা বা কাজ করতে পারবে। যার মন চঞ্চল সে কোন কিছু মন দিয়ে করতে পারে না। অঙ্ক বার বার ভুল করে। লেখার সময় বানান ভুল হয়। পড়ার সময় মনটা পড়ে থাকে খেলার মাঠে। আসলে ধ্যান শুধু ধর্মীয় ব্যাপার নয়, ধ্যান করার অভ্যেস হয়ে গেলে একমনে কাজ করা যায়। এজন্যে জাপানে ছেলে-বুড়ো সবাই নিয়মিত ধ্যান করে। নির্জনে বসে প্রতিদিন একঘণ্টা বা আধ ঘণ্টা ধ্যান করে তারা যখন নিজেদের কাজে যায় তখন তাদের কাজ হয় সবচেয়ে সুন্দর, সবার সেরা আর নিখুঁত।

যাইহোক সিদ্ধার্থ আলারের কাছে ধ্যান করা তো শিখলেন কিন্তু তাঁর মনে হতে লাগলো তিনি যা খুঁজছেন এপথে তা পাওয়া যাবে না। তাই আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। ভাবছ বুঝি ঘোড়ায় চড়ে ? মোটেই না। ঘোড়া আর রাজপোশাক তো তিনি খুলে দিয়েছেন এক ব্যাধকে। তার বদলে ব্যাধের ছেঁড়াখোঁড়া পোশাকটি পরে চলেছেন। একবেলা ভিক্ষে করেন। লোকের বাড়ির দরজায় গিয়ে চোখ নিচু করে চুপ করে দাঁড়ান। সবাই তাঁকে ডাকে, আদর করে খেতে দেয়, তাদের দেশে থাকতে বলে। সিদ্ধার্থ শুধু এগিয়ে চলেন। প্রথম দিন ভিক্ষে করে যা পেলেন তা খেতে বসে তাঁর বমি পেতে লাগলো। রাজার ছেলে তিনি। সোনার থালায় পরমান্ন খাওয়া অভ্যেস। মনকে বোঝালেন, 'সাধু হয়েছি যখন, তখন এই খেয়েই থাকতে হবে।'

শ্রাবস্তীতে পৌঁছে সিদ্ধার্থ আর একজন গুরু পেলেন, এঁর নাম উদ্রক রামপুত্র। কিছুদিন ধ্যান ও শাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা নেবার পর এখানেও তাঁর ভালো লাগলো না মনে হল, তিনি যা খুঁজছেন এভাবে তা পাওয়া যাবে না। অতএব বেরিয়ে পড়লেন। তোমরা বোধহয় ভাবছ গুরুমশায়ের ধমক-ধামক বুঝি সিদ্ধার্থের ভালো লাগলো না। তা নয়। তাঁর দুজন গুরুই তাঁকে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু মায়ার বন্ধনে সিদ্ধার্থ আর বাঁধা পড়লেন না।

গয়ায় এসে তিনি কিছুদিন নদীর ধারে বাস করলেন। কী নদী বলো তো ? ফল্গু। তখন তার নাম ছিল নীরাজনা। এসময় গৌতম কঠোর তপস্যা শুরু করলেন। না খেয়ে না খেয়ে তাঁর দেহ রোগা হয়ে গেল। শরীরকে যত রকম কষ্ট দেওয়া যায়, তিনি দিতে লাগলেন। তাঁর পাঁচজন শিষ্যও জুটে গেল। এঁদের নাম ছিল বপ্র, ভদ্রিক, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌণ্ডিন্য। এঁরা আগে থেকেই

তপস্যা করছিলেন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে জয় করেছেন বলে গর্ব করতেন। সিদ্ধার্থের কঠোর তপস্যা দেখে এঁরা তাঁর শিষ্য হয়ে অনুসরণ করতে লাগলেন।

সিদ্ধার্থ দিনের পর দিন তপস্যা করেন। কখনও একটিমাত্র কুল কি এক কণা চাল মুখে দেন আবার ধ্যানে বসেন আর ভাবেন কি করে তিনি শান্তিলাভ করবেন, জন্ম-মৃত্যুর ওপারে গিয়ে শান্তি পাবেন। ক্রমে দেহ অস্থিচর্মসার হল। সর্বাঙ্গের হাড় পাঁজর যেন গোনা যায়। উঠতে গেলে পড়ে যান। তখন তিনি বুঝতে পারলেন এভাবেও তিনি যা খুঁজছেন তা পাবেন না। শান্তি পেতে হলে শরীর সুস্থ থাকা দরকার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি থাকলে মন সেইদিকেই পড়ে থাকে। তাই স্থির করলেন নদীতে স্নান করে তিনি প্রথমে কিছু খাবেন তারপরে অন্য কাজ।

স্নান করে উঠে এলেন সিদ্ধার্থ। বসলেন বোধিবৃক্ষের নিচে। বোধিবৃক্ষ কথাটা খুব গোলমেলে। বুদ্ধগয়ায় গিয়ে যে প্রাচীন অশ্বত্থগাছটি চোখে পড়ে, সেটিকেই বলা হয় বোধিবৃক্ষ। কিন্তু অশ্বত্থগাছ মানেই যে বোধিবৃক্ষ তা নয়। অনেকে মনে করেন বুদ্ধদেব ঐ গাছের তলায় বসে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন বলে তাকে বলা হয় বোধিবৃক্ষ। যাইহোক গাছটি আজও আছে গয়ায়, প্রথম গাছটি না হলেও খুব পুরনো। তোমরা ওদিকে গেলে নিশ্চয় দেখে নিও। সেই গাছের নিচে বেদীর ওপর বসলেন সিদ্ধার্থ। গোপকন্যা সুজাতা নন্দবলা এসে তাঁকে প্রণাম করে খেতে দিলেন এক বাটি পায়েস। সেই পায়েস খেয়ে সিদ্ধার্থ অত্যন্ত তৃপ্তি পেলেন এবং ধ্যান শুরু করলেন। এদিকে তাঁর কাণ্ড দেখে তাঁর পাঁচ অনুগামী শিষ্য তাঁকে ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সেই গাছের তলায় বসেই ধ্যান করতে লাগলেন। স্থির করলেন সিদ্ধিলাভ না করে তিনি আর আসন ছেড়ে উঠবেন না, যদি দেহ শুকিয়ে যায়, হাড় চামড়া মাংস সব ডুবে যায় তবু বোধিজ্ঞান লাভ না করে তিনি উঠবেন না।

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ ধাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং
নৈবাসনাৎ বায়েমতশ্চলিষ্যতে।'

প্রথমে মার এসে তাঁকে ভয় দেখাতে লাগলো। এই একবার সিংহের মতো ডাক ছাড়ে আবার ভয়ানক রূপ নিয়ে তেড়ে আসে কিন্তু সিদ্ধার্থ ভয় পেলেন না। ধ্যানের মধ্যেই তাঁর দিব্য দৃষ্টি লাভ হল। তিনি সংসারের অসারতা বুঝতে পারলেন, তাঁর সমস্ত দুঃখ কষ্ট দূর হয়ে গেল। এতদিনে তাঁর আশা পূর্ণ হল,

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। বিদ্যার আলো দিয়ে মনের অন্ধকার দূর করতে পারলেন বা বোধি লাভ করলেন বলে তাঁর নাম হল বুদ্ধ। অন্য সব নাম এই নামের আড়ালে চাপা পড়ে গেল।

বুদ্ধত্ব লাভ করে সিদ্ধার্থ বিশ্বের মুক্তির কথা ভাবতে শুরু করলেন। আগেই বলেছি তিনি অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন। সবার কথা ভাবতেন। তাই তাঁর মনে হল বুদ্ধত্ব লাভ করে তিনি যে আনন্দ পেয়েছেন তার ভাগ অন্যদেরও দেবেন। বুদ্ধত্ব সকলেই পেতে পারে তাহলে তারা কেন মিছিমিছি দুঃখ শোক জরার মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে আসা-যাওয়া করবে। প্রথমেই তাঁর মনে পড়লো তাঁর গুরুমশায়দের কথা। ছ বছর কেটে গেছে তবু বুদ্ধ বেরোলেন তাঁর গুরুদের খোঁজে। শ্মশানের ফেলে দেওয়া কাপড় পরেই তিনি দিন কাটাতেন। খেতেনও অতি সামান্য। নিজের জীবন রক্ষার জন্যে অপরের প্রাণ নেওয়াকে তিনি পছন্দ করতেন না। তপস্যা করে তিনি জেনেছিলেন মনকে কামনা বাসনা শূন্য করলে তবেই শান্তি পাওয়া যায়। যাইহোক, খোঁজ করে জানলেন তাঁর দুই গুরুই মারা গিয়েছেন। তাঁদের কাছে পৌঁছবার আর কোন উপায় নেই। তখন তিনি স্থির করলেন সেই পঞ্চ ভিক্ষুকে খুঁজতে যাবেন, যাঁরা তাঁকে ছেড়ে বারাণসীতে চলে গিয়েছিলেন। খুঁজতে খুঁজতে বুদ্ধদেব তাঁদের দেখা পেলেন সারনাথে। তাঁরাও বুদ্ধদেবকে চিনতে পারলেন কিন্তু ঠিক করলেন কেউ বুদ্ধদেবের কাছে যাবেন না, আর বুদ্ধদেব যদি তাঁদের কাছে আসেনও তবু কেউ উঠে দাঁড়াবেন না। যেমন কথা তেমনি কাজ। বুদ্ধদেব আসছেন, তবু বসেই আছেন পঞ্চভিক্ষু। কিন্তু যেই তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন অমনি সব ভুলে উঠে দাঁড়ালেন সকলে মিলে। বুদ্ধদেব বললেন, 'আমি তোমাদের জন্যে মুক্তির সংবাদ এনেছি।' সারনাথের যেখানে বসে বুদ্ধদেব প্রথম উপদেশ দিলেন সে জায়গাটার নাম ছিল মৃগদাব বা ঋষিপত্তন। নাম শুনে মনে হচ্ছে সেখানে হরিণ চরে বেড়াত। বেশ নির্জন জায়গা। অনেকেই উপদেশ শোনবার জন্যে এলো। বুদ্ধদেবকে সর্ব প্রথম স্বীকার করলেন কৌণ্ডিন্য। তারপর বপু ও ভদ্রিক। সবশেষে মহানাম ও অশ্বজিৎ তাঁর ধর্মকে গ্রহণ করলেন। এই সারনাথেই বুদ্ধদেব ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। দার্জিলিঙে গেলে তিব্বতীদের হাতে এই ধর্মচক্র দেখতে পাবে। সেটা সব সময় তারা হাতে করে ঘোরায়, অনেকটা আমাদের ঠাকুরমাদের হাতের জপের মালার মতো। বড়ো বড়ো মঠ বা মনস্টারিতে আছে বিশাল বিশাল ধর্মচক্র। যে যায় সেই একবার ঘুরিয়ে দেয়। আসলে ধর্মচক্র হচ্ছে জ্ঞান লাভের উপায়। বুদ্ধদেব চূড়ান্ত সুখ ও চূড়ান্ত দুঃখের পথে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। জ্ঞানীরা মধ্যমার্গে চলেন এবং নির্বাণের পথে এগিয়ে যান। এই মার্গটি হল

অষ্টাঙ্গিক, মানে আটটি—সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক কর্মান্ত, সম্যক আজীব, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি।

সারনাথে বুদ্ধদেব উপদেশ দিলেন। বললেন, 'মানুষের দেহটা হচ্ছে দুঃখের খাঁচা। এই দেহটা আছে বলেই আমাদের এত দুঃখ-কষ্ট, রোদ-জল, রোগ-জরা সব সহ্য করতে হচ্ছে। একে ভেঙে ফেলতে হবে। আর জীবনের যে প্রদীপশিখাটি এক জন্ম থেকে জন্মান্তরে তোমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেই প্রদীপটা নিবিয়ে ফেল। তাহলেই তোমরা লাভ করবে নির্বাণের পরম আনন্দ। দুঃখ কষ্ট ভরা পৃথিবীতে আর জন্মাতে হবে না। এ পৃথিবীতে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, কিছুই যখন তোমার নয়, তখন 'আমার' 'আমার' বলে সবকিছুকে আঁকড়ে ধরে থেকো না, তাতে দুঃখ বাড়বে বই কমবে না। ত্যাগ করো, কাউকে হিংসা কোরো না। কেউ তোমাকে মারলেও তুমি তাকে মেরো না। কোন জীবজন্তুকেও না।'

বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না কিন্তু জন্মান্তর বিশ্বাস করতেন। তিনি মনে করতেন আমরা ভাল মন্দ যাই করি না কেন তার ফল পাবই, আর এই কর্মফল ভোগ করবার জন্যেই মানুষ বারবার জন্মাবে আর মরবে। আমাদের কামনা-বাসনা, পাবার ইচ্ছে, দেবার ইচ্ছে, আদর করবার ইচ্ছে, চড় মারবার ইচ্ছে সবই কর্মফল হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলে। দান, ধ্যান, অহিংসা প্রভৃতি ভাল কাজ করেই কর্মফলের বন্ধন ছিন্ন করতে হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গ তার শ্রেষ্ঠ উপায়।

এখানে তোমাদের জানিয়ে রাখি, হিন্দুরা কি বলেন। গীতার উপদেশেও শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে কর্মফল ত্যাগ করতে বলেছিলেন। বলেছিলেন, কাজ কর ফলের আশা কোরো না। লেখাপড়া তোমাদের কর্তব্য, লেখাপড়া কর, পরীক্ষায় ভালো ফলের আশা কোরো না এই রকম আর কি। খুব বেশি আশা করে না পেলে কষ্ট হবে কিন্তু কোন আশা না করে কাজ করলে যা পাবে তাতেই সন্তুষ্ট হতে পারবে। তাই গীতায় কর্মকে ত্যাগ করতে বলা হয়নি। যাক সে কথা। আমরা বুদ্ধদেবের কথায় ফিরে আসি।

বুদ্ধদেবের উপদেশ যে সবাই খুব ভালো করে বুঝতে পারলো তা নয়। বুদ্ধদেব নিজেও জানতেন সেকথা। সেজন্যে তিনি মোটেই নির্বাণের কথা সবাইকে বলতেন না। তার বদলে গল্প শোনাতেন। গল্পচ্ছলে এক একটা উপদেশ। সেই উপদেশের সার কথা ছিল, আমাদের জীবন যে এত দুঃখের তার কারণ আমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। আমরা শুধু নিজেদের জন্যেই সব কিছু চাই—তাই এত দুঃখ। এর হাত থেকে মুক্তির উপায় হচ্ছে আত্মবিসর্জন। জগতের জন্যে জীবন উৎসর্গ

করা। অনেকটা পঞ্চতন্ত্র আর হিতোপদেশের গল্পের মতো। সে সব গল্প তোমাদের নিশ্চয় পড়া। গল্পের মধ্যে দিয়েই বুদ্ধদেব তাদের শোনাতেন সংসার কত অসার, কত অর্থহীন আর একই দুঃখকষ্ট বারে বারে কিভাবে পেতে হয়। দু-একটা শুনলেই তোমরাও বুঝতে পারবে। তার আগে বলে নিই বুদ্ধদেব সাধারণ মানুষকে কিভাবে বোঝাতেন।

মানুষকে বোঝানো সহজ নয়। 'এই কাজটা কোরো' আর 'এই কাজটা কোরো না' বললেই হয় না। 'এটায় হাত দিও না, ওখানে যেও না' বলে ধমক লাগালেও কিছু হয় না। তখনি মনে হবে 'কেন করব না, বেশ করব।' কিন্তু একবার যদি ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়া যায় এ কাজটি কোরো না বাপু, এর আগেও এ কাজ অনেকে করেছে আর ফলভোগ করেছে তখন তার শিক্ষা হয়। বুদ্ধদেব সেজন্যে ঠিক করলেন তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে মানুষকে বোঝাবেন। সাধারণ মানুষ শাস্ত্র-টাস্ত্র বিশেষ বোঝে না। কিসে তার ভালো হবে সেটাই শুনতে চায়। সেজন্যে পুজোটুজো করবার জন্যে যায় পুরোহিতের কাছে। তিনি সংস্কৃত পুঁথিটুথি পড়ে যা বলেন তাই শোনে, নিজেরা কিছু বোঝে না। সেকালেও লোকেরা বুঝত না। পুরোহিতরাও সেই সুযোগে সবই দুর্বোধ্য ভাষায় বলতেন। বুদ্ধদেব ঠিক করলেন তিনি ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা বলবেন। সেই ভাষা হচ্ছে পালি ভাষা। সাধারণ মানুষ তাদের সুখদুঃখের গল্প পালি ভাষাতেই করত। মন্ত্র-টন্ত্র এখন যা তখনও তাই, পড়া হত সংস্কৃত ভাষায়। অনেকেই তার মানে বুঝতে পারতো না। বুদ্ধদেব গল্প-উপদেশ সবই শোনাতেন পালি ভাষায়। তাঁর গল্পগুলোর নাম জাতকের গল্প। আর উপদেশ হল ধম্মপদ। বৌদ্ধ জাতকগুলি ঠিক কবে লেখা হয়েছে জানা যায়নি, অনেকের মতে বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অনেক পরে। কিন্তু ধম্মপদ হচ্ছে বুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। আসলে গল্পের পরে এই উপদেশ দেওয়া হত। জাতকের গল্পগুলোই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন গল্প। রামায়ণ-মহাভারতের গল্পও জাতক-কাহিনীতে পাওয়া যায় তবে সেগুলো অন্য রকমের। কোনটা আগে কোনটা পরে আজ আড়াই হাজার বছর পরে তা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। জাতক কাহিনীতে বলা হয়েছে সবগুলোই বুদ্ধদেবের পূর্ব জন্মের গল্প। কোন গল্পে তিনি ছিলেন হাতি, কোন জন্মে হরিণ, কোন জন্মে শ্রেষ্ঠী বা বণিকপুত্র আবার কোন জন্মে হয়তো জ্ঞানী পণ্ডিত। বুদ্ধত্ব লাভ করার পরে বুদ্ধদেবের সমস্ত পূর্বজন্মের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি দেখেছিলেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। যারা এক জন্মে মারামারি করে তারা পরের জন্মেও তাই করে। যে এক জন্মে লোক ঠকায় সে পরের জন্মেও সেই কাজ করে। হিংসা দিয়ে হিংসাকে জয় করা যায় না, ক্রোধ দিয়ে ক্রোধ জয় করা

বোধিবৃক্ষের নিচে বুদ্ধদেবের আসন

যক্ষমূর্তির আদলে বুদ্ধ

বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন

ইতালিয়ান শিল্পীর কল্পনায় বুদ্ধ

বর্মপরা বুদ্ধমূর্তি, ফনদুকিস্তান

বোধিসত্ত্ব, ফনদুকিস্তান

বোধিসত্ত্বের আরেক রূপ

বোধিসত্ত্ব চুল কাটছেন, তিব্বত

মুকুট-পরা বুদ্ধদেব, বঙ্গদেশ

বুদ্ধদেবের কঙ্কালসার মূর্তি

গান্ধারশিল্পীর কল্পনায় ধ্যানী বুদ্ধ, তক্ষশিলা

মথুরার শিল্পীর গড়া বুদ্ধমূর্তি, কাতরা

শ্রাবস্তীর অলৌকিক দৃশ্য

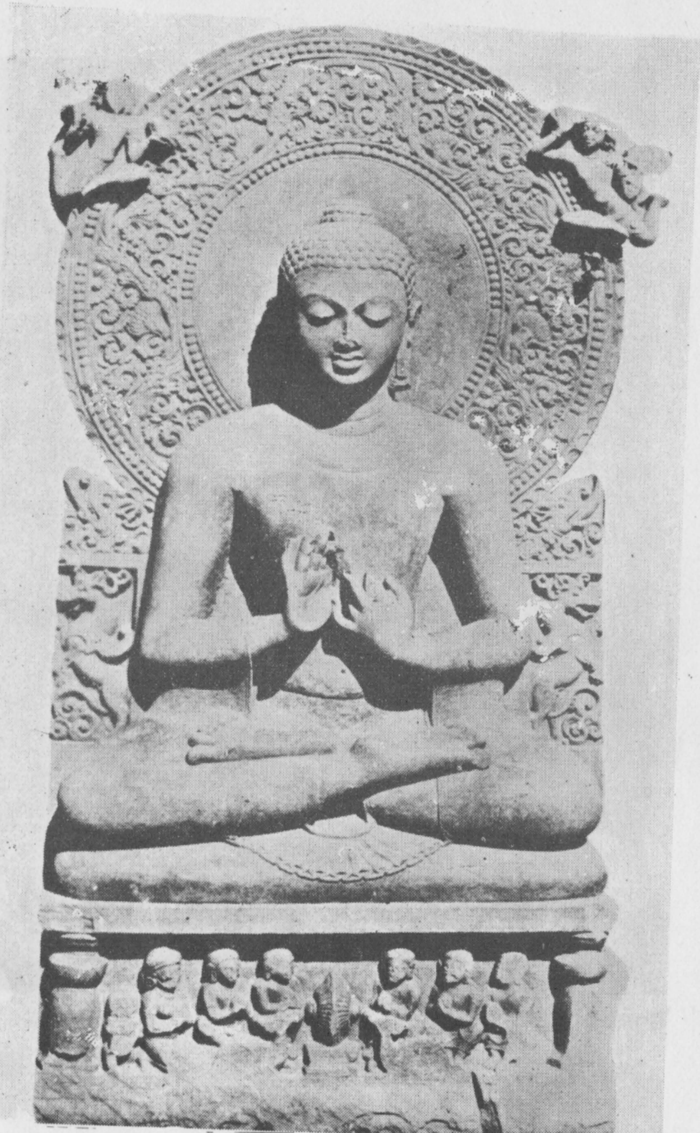

বুদ্ধদেবের প্রথম উপদেশদান, সারনাথ

উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি, জাপান

বোধিসত্ত্ব, চীন

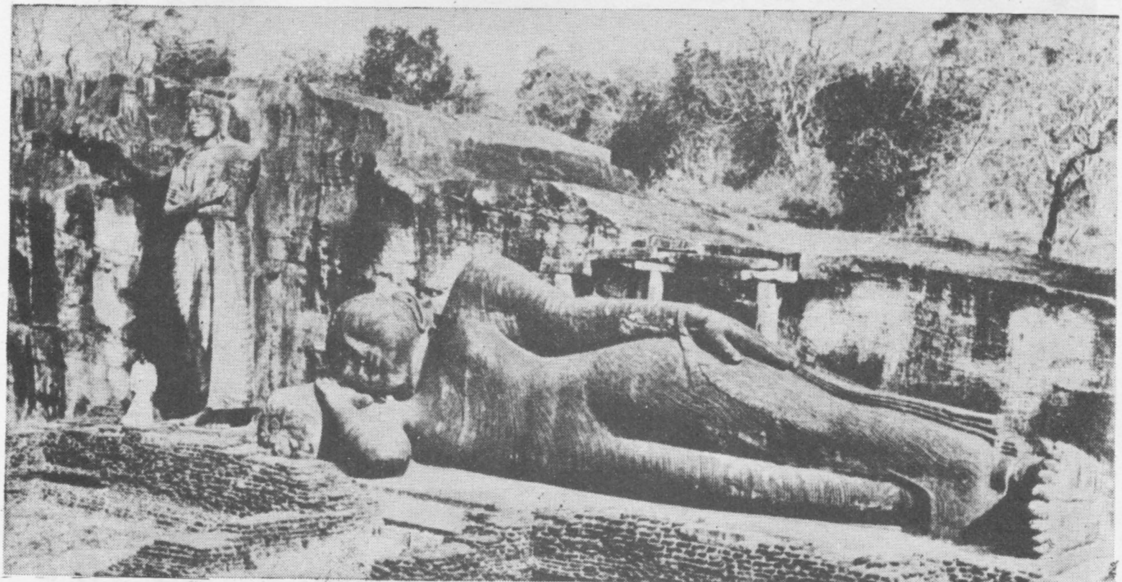

বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভ

যায় না। একজন তোমাকে মারলে তুমিও তাকে এক ঘা বসিয়ে দিতে পারো বটে কিন্তু তাতে মারামারি বন্ধ হবে না, তুমি যদি তাকে ক্ষমা করো তবেই মারামারি বন্ধ হবে, সেও নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

এই জাতকের গল্পের সংখ্যা যে ঠিক কত কেউ তা জানে না। যতদূর মনে হয় এদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচশোর মতো। ধম্মপদে গাথার সংখ্যা চারশো তেইশটি। বুদ্ধদেব এত গল্প বলেছিলেন ? বলবেন বইকি ! বুদ্ধত্ব লাভ করার পর তিনি বেঁচেছিলেন আরো পঁয়তাল্লিশ বছর। এতদিন ধরে তিনি শুধুই ভক্তদের গল্প বলেছেন আর উপদেশ দিয়েছেন। হয়তো আরো অনেক গল্প বলেছিলেন কিন্তু সেগুলো কেউ লিখে রাখেনি বলে হারিয়ে গেছে। জাতকের প্রায় সব গল্পেই দেখা যায় বুদ্ধদেব শ্রাবস্তীর জেতবনে বসে উপদেশ দিচ্ছেন এমন সময় একজন এসে বলল, ঐ ভিক্ষু অনেককে ঠকাতো এবার সে নিজেই জব্দ হয়েছে। তখন বুদ্ধদেব বলতেন, ঐ ভিক্ষু আগেও এভাবে জব্দ হয়েছিল। শোনো সেই গল্প। এভাবে গল্প শুরু করতেন। তোমাদেরও দু-একটা শোনাবো তার আগে জেতবনের কথাটা বলে নিই। কেন সব জাতকের গল্পে জেতবনের কথা থাকে। কোথায় এই জেতবন ?

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণে আছে, বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্য সারিপুত্তকে নিয়ে বিহার স্থাপনের জন্যে জায়গা খুঁজছিলেন। বিহার হচ্ছে বৌদ্ধ মঠ, বিভিন্ন জায়গায় এর বিভিন্ন নাম, কোথাও সংঘারাম, কোথাও জং; সেখানেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা থাকতেন। লেখাপড়া শিখতেন, শাস্ত্র আলোচনা করতেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে শ্রাবস্তীর জেতবনটি তাঁদের পছন্দ হল। শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিতের ছেলে জেতের সাজানো বাগান সেটি। শ্রাবস্তী ছাড়িয়ে একটু যেতে হয়। আজও জেত-বন আছে তবে এখন তার নাম সাহেত আর শ্রাবস্তীর নাম হয়েছে মাহেত। শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদেব তাঁর অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। সারিপুত্ত রাজকুমার জেতকে বললেন ঐ বাগানটি বিক্রি করতে। রাজকুমার বাগানের জন্যে অসম্ভব দাম চাইলেন। বললেন, স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গোটা বাগানটি ঢেকে দিতে হবে। একটুও মাটি দেখা যাবে না। বুদ্ধদেব এত টাকা কোথায় পাবেন ? কিন্তু তাঁর পরম ভক্ত শ্রাবস্তীর শ্রেষ্ঠী সুদত্ত, পরে যাঁর নাম হয়েছিল ভিক্ষু অনাথপিণ্ডদ, তিনি বললেন, 'তাই হোক। আমি দেব স্বর্ণমুদ্রা।' গরুর গাড়ি করে ভারে ভারে স্বর্ণমুদ্রা এলো। দুজন লোক সোনার টাকা দিয়ে মাটি ঢাকতে বসলো, একজন তাদের হাতে হাতে ইটের মতো স্বর্ণমুদ্রা তুলে দিতে লাগলো। ভাবছো বুঝি কি করে জানা গেল এ খবর ? খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে তৈরি হয়েছিল ভারহুতের স্তূপ, তার গায়েই আঁকা আছে এই ছবিটি।

সোনার মুদ্রায় বাগানের সব ঢাকা পড়লো না, শুধু একটু জায়গা বাকি রয়ে গেল। তখন জেত বললেন, 'এতেই হবে।' তারপর সেই জমিটুকুতে তিনি নিজে একটি মন্দির তৈরি করে দিলেন। সুদত্ত কত সোনার মুদ্রা ছড়িয়েছিলেন বলো তো? আঠারো কোটি। জেত সেই সমস্ত মুদ্রা বুদ্ধদেবের সেবার জন্যেই দান করলেন। তখন সুদত্ত আরো আঠারো কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিলেন বিহারের কুটির, কূপ, মন্দির প্রভৃতি তৈরি করবার জন্যে। মোট চুয়ান্ন কোটি টাকা খরচ করে তৈরি হল জেতবন। বুদ্ধদেব তাঁর দুই ভক্তের কথা শুনে বললেন তাহলে এর নাম হোক 'জেতবন-বিহারের অনাথ পিণ্ডদকের আরাম'। বর্ষাকালে বুদ্ধদেব এখানেই বিশ্রাম করতেন এবং চব্বিশটি বর্ষা তিনি এখানে কাটান। যতদূর মনে হয়, এই বিহারে বসে বুদ্ধদেব যে জাতকের গল্পগুলি বলেছিলেন সেগুলোই রক্ষা পেয়েছিল, তাই সব জাতকেই জেতবনের কথা আছে। অন্যান্য অঞ্চলের গল্পগুলোর দু চারটি ছাড়া অধিকাংশই হয়তো গেছে হারিয়ে। তাদের আর খুঁজে পাবার কোন উপায় নেই।

তবে জেতবনের মতো আরো কয়েকটা বাগান বা বন বুদ্ধদেব পেয়েছিলেন। শুধু তো শ্রাবস্তী নয়, তিনি বৈশালী, রাজগৃহ ও পাটলিগ্রামেও যেতেন। এখন আমরা যাকে বলি উত্তর প্রদেশ আর বিহার—বুদ্ধদেব এই রাজ্য দুটিতেই ঘোরা-ফেরা করতেন। তখনকার দিনে পায়ে হেঁটে ঘুরতে হত বলে এইটুকু জায়গাকেই মনে হত অনেকখানি। শোনা যায়, বৈশালীতে প্রচণ্ড মহামারী দেখা দিলে নগরের লোকেরা খুব বিপদে পড়েছিল। শেষে তারা শুনলে বুদ্ধদেবকে সেখানে আনতে পারলে সব রোগ-শোক দূর হবে। দূত গেল। বুদ্ধদেব তখন রাজগৃহের বেণুবনে বিশ্রাম করছেন। দূত এসে তাঁকে কাতর প্রার্থনা জানালো। বুদ্ধদেব রাজি হলেন। রাজগৃহ থেকে রাজা বিম্বিসার তাঁকে নিয়ে চললেন রাজ্যের সীমানা পর্যন্ত। অপর সীমা থেকে বৈশালীর লোকেরা তাঁকে নিয়ে যাবে। রাজগৃহ থেকে গঙ্গার তীর পর্যন্ত পথটি পরিষ্কার করে তার ওপর ফুলের মতো নরম কাপড় বিছিয়ে দেওয়া হল। বুদ্ধদেবের পায়ে না ধুলো লাগে। এক যোজন অন্তর শিবির, জলসত্রে জলের সঙ্গে খাদ্য ও বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হল। ছত্রধরদের হাতে রত্নখচিত পাঁচশো ছাতা। সবাই মনে মনে প্রার্থনা করছে 'আমার ছাতা যেন বুদ্ধদেবের মাথায় ছায়া ফেলে'। বুদ্ধদেবের অপার মহিমা। সবাই দেখলো তারই ছাতার নিচে দিয়ে বুদ্ধদেব চলেছেন। বৈশালীতে এসে বুদ্ধদেব বেছে নিলেন মহাবন। বড়ো বড়ো গাছের তলায় দিব্যি ছায়া। সেখানেই বসলেন বুদ্ধদেব। তাঁর মনের কথাটি জানতে পেরে বৈশালীর লোকেরা বুদ্ধদেবকে মহাবনটি দান করলো। রাজনটী আম্রপালী তাঁকে দিলেন আম্রবন,

একটি বালিকা তাঁকে নিমন্ত্রণ করে উপহার দিল বালিকাবন। এই সব জায়গায় বিহার ও সংঘ তৈরি হয়েছিল। যাক আমরা আবার জেতবনে ফিরে আসি। যেখানে বসে বুদ্ধদেব শিষ্যদের জাতকের গল্প শোনাতে বসছেন সেখানে।

আগেই বলেছি বুদ্ধদেব উপদেশ দিতেন গল্পের মধ্য দিয়ে। একদিনের কথা বলছি। জেতবনে অনেক ভিক্ষু ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একজন খুব ভাল 'চীবর' তৈরি করতে পারত। চীবর হচ্ছে পুরনো কাপড় সেলাই ও রঙ করা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পোশাক। বুদ্ধদেব নিজে প্রথমে মৃতদেহর ফেলে দেওয়া ছেঁড়া কাপড়ের চীবর তৈরি করে নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নিজের শিষ্যদের জন্যে এরকম কোন নিয়ম করে দেননি। তাঁরা সব কিছু ছেড়ে সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু হতেন। তারপর ভিক্ষে করে অন্ন-বস্ত্র জোগাড় করতেন। ভিক্ষেয় পুরনো কাপড়ই পাওয়া যায়। সেই কাপড় এনে সেলাই করে রঙ করে তাঁরা পরতেন। জেতবনের এই ভিক্ষু খুব ভালো করে সেলাই ও রঙ করতে পারতেন বলে অন্য ভিক্ষুরা নিজেদের ভিক্ষেয় পাওয়া নতুন-পুরনো সব কাপড় এনে ঐ ভিক্ষুকে দিয়ে বলতেন, 'ভাই আমরা চীবর তৈরি করতে পারি না, তুমি করে দেবে ?' আসলে সেই ভিক্ষুটি খুব লোভী ছিল, দুষ্টুও কম ছিল না। সে করত কি একটা পুরনো কাপড়ের চীবর বেশ গাঢ় আর উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে আগে থেকেই রেখে দিত। অন্য ভিক্ষু এলে বলত, 'ভাই, চীবর তৈরি করতে তো অনেক সময় লাগবে। এই একটা তৈরি করা আছে। একদম নতুন। নতুন কাপড়ের বদলে যদি নিতে চাও তবে নিয়ে যাও।' ভিক্ষুরা বাইরের চটক দেখে ভুলে যেতেন ও নতুন কাপড় দিয়ে সেই পুরনো চীবর নিয়ে ফিরে আসতেন। তারপর ময়লা হলে যখন তাঁরা চীবরটি গরম জলে কাচতে যেতেন অমনি রঙ উঠে এখানে ওখানে ছেঁড়া, ফাটা, জোড়া, তালি বেরিয়ে পড়ত।

এ সময়ে কাছাকাছি গ্রামে আর একজন চালাক চতুর ভিক্ষু থাকতেন আর জেতবনের ভিক্ষুর মতোই গ্রামের লোকেদের চীবর তৈরি করার নাম করে ঠকাতেন। একদিন তিনি শুনলেন জেতবনের ভিক্ষুর কথা। ভাবলেন, দেখা যাক সে কত বড়ো চালাক। আমি তাকেও ঠকাবো। তারপর তিনি খুব পুরনো কাপড় দিয়ে একটা সুন্দর চীবর তৈরি করে টুকটুকে লাল রঙে রাঙিয়ে সেটি পরে জেতবনে বেড়াতে এলেন। জেতবনের লোভী ভিক্ষু সেটি দেখে লোভে পড়ে বললেন, 'এই চীবরটি কি আপনি তৈরি করেছেন ?'

'হ্যাঁ ভাই।' গ্রামের ভিক্ষু বললেন।

'এই চীবরটি আমাকে দিন না। আমি এর বদলে অন্য কিছু দেব।'

'আমরা গ্রামের ভিক্ষু। গ্রামে কাপড় টাপড় সহজে পাওয়া যায় না। এই

চীবর দিলে আমি কি পরবো ?'

'আমার কাছে কিছু নতুন কাপড় আছে। আপনি সেগুলো নিয়ে যান। নতুন চীবর তৈরি করে নেবেন।'

গ্রামবাসী ভিক্ষু যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় নিরুপায় হয়ে বললেন, 'আমি অনেক কষ্ট করে এটা তৈরি করেছিলাম। তা যাক আপনার যখন এত ভাল লেগেছে তখন আর কি বলব ? আপনিই নিন।' এই বলে তিনি পুরনো চীবরটি দিয়ে নতুন কাপড় নিয়ে সরে পড়লেন।

জেতবনের ভিক্ষু কিছুদিন পরে চীবর কাচতে গিয়ে ব্যাপারটা টের পেয়ে হায় হায় করতে লাগলেন। অন্য ভিক্ষুরাও ব্যাপারটি শুনে ধর্মসভায় বসে আলোচনা করছেন। বুদ্ধদেব তখন বললেন, 'জেতবনের ভিক্ষু আগের জন্মেও এমন করে ঠকাতেন, আবার নিজেও ঠকেছেন। শোনো সেই গল্প।'

শুরু হল জাতকের গল্প। অনেকদিন আগে এক বনে পদ্ম সরোবরের ধারে বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে বাস করছিলেন। তখনকার কথা। একটা বড়ো পুকুরের জল প্রতি বছর গরমকালে খুব কমে যেত। সেই পুকুরে অনেক মাছ ছিল। একটা বক তাদের দেখে ভাবলো 'এদের কোনরকমে ঠকিয়ে কোথাও নিয়ে গিয়ে খেতে হবে।' তারপর খুব গম্ভীরভাবে পুকুরের ধারে এসে বসে রইল। মাছেরা বলল, 'আপনি এরকম করে বসে আছেন কেন ?'

বক বললে, 'আমি তোমাদের কথাই ভাবছি।'

'আমাদের জন্যে আপনার চিন্তা কিসের ?'

'এই পুকুরের জল কমে গেছে, বড্ড গরমও পড়েছে। ভাবছি, মাছ বেচারারা কি করবে ?'

'আমরা কি করব ?'

'তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর তাহলে কিছুদূরে একটা বড়ো সরোবর আছে, আমি তোমাদের একটা একটা করে নিয়ে যেতে পারি।'

'কিন্তু বকেরা তো মাছেদের কথা ভাবে না। একটি একটি করে আমাদের খাবার মতলব করেছেন বুঝি ?'

'না না, তোমরা যদি আমাকে বিশ্বাস কর তো আমি কাউকে খাবো না। বেশ তো বিশ্বাস না হয় একজন আমার সঙ্গে চল, গিয়ে সরোবর দেখে আসবে।'

মাছেরা ভেবে-চিন্তে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান একটা প্রকাণ্ড কানা মাছকে বকের সঙ্গে পাঠালো। বক সত্যি সত্যিই তাকে সরোবর দেখিয়ে নিয়ে এলো। সে এসে মাছেদের কাছে সরোবরের গল্প বলাতে তারা সবাই সেখানে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। বককে বলল, 'আপনি আমাদের নিয়ে চলুন।'

বক প্রথমেই কানা মাছকে নিয়ে গেল এবং সরোবরের ধারে একটা গাছে বসে তাকে খেয়ে ফেললো। কাঁটাগুলো পড়ে রইল গাছতলায়। পরদিন আবার এসে বললো, 'তাকে জলে ছেড়ে এসেছি, এবার কে যাবে চল।' এইভাবে একটি একটি করে মাছ নিয়ে গিয়ে বক সব মাছ খেয়ে ফেললো। শেষে বাকি রইল শুধু একটা কাঁকড়া। সে প্রথম থেকেই মাছের দলে ভেড়েনি। এবার বক তাকে বলল 'ওহে, তুমিই বা পড়ে থাকবে কেন, চল তোমাকেও দিয়ে আসি।'

কাঁকড়া বলল, 'আমাকে কি করে নিয়ে যাবে ?'

'কেন ? ঠোঁটে করে।' বকের তখন খুব কাঁকড়া খাবার ইচ্ছে। কাঁকড়া বললে, 'না, তুমি হয়তো রাস্তায় আমাকে ফেলে দেবে। আমার হাড়গোড় ভেঙে যাবে। আমি তোমার সঙ্গে যাব না।'

বকও ছাড়বে না। বলল, 'আমি খুব শক্ত করে ধরে নিয়ে যাব।'

কাঁকড়া ভাবলো, পাজি বকটা নিশ্চয় মাছগুলোকে খেয়ে ফেলেছে। দেখা যাক আমাকে নিয়ে কি করে। জলে ছেড়ে দেয় তো ভালো কথা। নইলে আমিও ওর গলা কেটে ফেলব। মুখে বলল, 'দেখো, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখতে পারবে না, তবে আমি খুব শক্ত করে ধরতে পারি। আমি আমার দাঁড়া দুটো দিয়ে তোমার গলা ধরে থাকব। এতে যদি রাজি হও তাহলে যাব।'

বক কাঁকড়ার চালাকি ধরতে না পেরে রাজি হয়ে গেল। কাঁকড়া সাঁড়াশির মতো দাঁড়া দিয়ে বকের গলা চেপে ধরলো। তারপর সরোবরের ধারে বক গাছের দিকে যাচ্ছে দেখে কাঁকড়া বলল, 'একি, সরোবর এদিকে রইল, তুমি আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

বক বলল, 'বেটা আমি কি তোর চাকর যে তোকে ঘাড়ে করে নিয়ে বেড়াবো। বরুণ গাছের তলায় একরাশ কাঁটা দেখতে পাচ্ছিস ? মাছগুলোকে যেমন খেয়েছি, তোকেও তেমনি করে খাব।'

কাঁকড়া বলল, 'মাছগুলো বোকা, তাই মরেছে। আমাকে তুমি খেতে পারবে না, উল্টে তুমিই মরবে। আমি তোমার গলা কেটে মাটিতে ফেলে দেব।' বলেই সে দাঁড়াজোড়া দিয়ে সাঁড়াশির মতো বকের গলা টিপতে লাগল। ভয়ে যন্ত্রণায় বক কেঁদে ফেলে বলল, 'তুমি আমাকে যা বলবে তাই করব। আমাকে প্রাণে মেরো না।'

কাঁকড়া বলল, 'আমাকে আগে সরোবরের তীরে পৌঁছে দাও।' বক তাই করল। কাঁকড়াকে জলের ধারে কাদার ওপর ছেড়ে দিল। কিন্তু কাঁকড়া জলে নামবার আগে তার ধারালো দাঁড়া দিয়ে বকের গলাটা কচ্ করে কেটে দিল। বৃক্ষদেবতা তার প্রশংসা করলেন।

এতদূর পর্যন্ত বলে বুদ্ধদেব এবার বললেন,'জেতবনের এই ঠক্ ভিক্ষু আগের জন্মে ছিল সেই বক, গ্রামের ভিক্ষু ছিল সেই কাঁকড়া আর আমি ছিলাম সেই বৃক্ষদেবতা। গল্পটি বলে বুদ্ধদেব বোঝালেন মানুষ জন্মের পর জন্ম একই কাজ করে আর তার ফল ভোগ করে। যতক্ষণ না ভাল কাজ করে সে তার পাপ ক্ষয় করছে ততক্ষণ তার মুক্তি নেই।

জেতবনে বাস করবার সময় বুদ্ধদেব আরো অনেক গল্প বলেছিলেন। তাঁর অনেক গল্পেই সারিপুত্ত, মৌদ্‌গল্যায়ন ও অঙ্গুলিমালের কথা আছে। তিন জনেই বুদ্ধদেবের শিষ্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে সারিপুত্ত আর মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন দুই বন্ধু। আর অঙ্গুলিমাল এক ভয়ঙ্কর ডাকাত। শিষ্যদের মধ্যে সারিপুত্ত আর মৌদ্‌গল্যায়ন ছিলেন বুদ্ধদেবের সবচেয়ে বড়ো শিষ্য। এই দুই বন্ধুর সংসারে থাকতে ভালো লাগছিল না বলে সংসার ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রথমে যে আশ্রমে গিয়েছিলেন, রাজগৃহের সঞ্জয়ী বৈরট্টি পুত্রের সেই আশ্রমটি তাঁদের ভালো লাগেনি। বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তবে তাঁরা শান্তি পান। সারিপুত্ত ব্রাহ্মণের ছেলে ছিলেন এবং বুদ্ধদেবের প্রথম ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন তিনিই। সেজন্যে অনেক কথা উঠেছিল। গৌতম বুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সন্তান, তাঁর শিষ্য হবেন ব্রাহ্মণ এ কেমন কথা? সারিপুত্ত খুব ভালো তর্ক করতে পারতেন। তিনি যুক্তি দিয়ে সব তর্ক খণ্ডন করেন। তাঁর মায়ের নাম ছিল সারি, অনেক সম্পত্তি ছিল তাঁদের, কিন্তু ছেলেই যখন সব ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেল তখন মা সম্পত্তি নিয়ে কি করবেন? তিনি সব বৌদ্ধসংঘে দান করে দিলেন। বুদ্ধদেবের যখন ঊনআশি বছর বয়স তখন সারিপুত্ত নির্বাণ লাভ করেন। তিনি ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছিলেন বলে অন্য ভিক্ষুরা তাঁকে খুব হিংসে করতেন। বুদ্ধদেব তাঁদের বুঝিয়ে শান্ত করেন।

সারিপুত্তের মতো তাঁর বন্ধু মৌদ্‌গল্যায়নও শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুর পদ পেয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় বন্ধুর মৃত্যুর পনেরো দিনের মধ্যেই। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! মৌদ্‌গল্যায়নের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল। তাঁর কথা শুনে ও অলৌকিক ক্ষমতা দেখে দলে দলে লোকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করত। যতদূর মনে হয় তিনি তপস্যাবলে আকাশে উঠে যেতে পারতেন, যাদুকরের মতো। সাধারণ মানুষ সেজন্যে তাঁকে ভয় ও ভক্তি দুই করত। এসব দেখে যাঁরা বৌদ্ধ নন তাঁদের খুব রাগ হল। তাঁরা মৌদ্‌গল্যায়নকে মারবার জন্যে অনেক টাকা দিয়ে কয়েকজন ঘাতক ঠিক করলেন। সোজা কথায় গুণ্ডা দিয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করলেন। দুদিন ঘাতকরা মৌদ্‌গল্যায়নের গুহা ঘিরে ফেলেও কিছু করতে পারলো না, তিনি আকাশে উঠে গেলেন। কিন্তু শেষে মৌদ্‌গল্যায়ন বুঝতে

পারলেন, পূর্বজন্মে তিনি যে তাঁর বৃদ্ধ ও অন্ধ বাবা ও মাকে জঙ্গলের মধ্যে বাঘ সিংহের সামনে ফেলে পালিয়ে এসেছিলেন, সেই মহাপাপের শাস্তি তাঁকে পেতেই হবে। কেউ রক্ষা করতে পারবেন না। ভগবান বুদ্ধও না। তাই তিনি আর পালাবার চেষ্টা করলেন না। ঘাতকরা এসে তাঁকে মেরে হাড়গোড় ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে চলে গেল। মৌদ্‌গল্যায়ন তখনও মরেননি। তিনি অনেক কষ্টে বুদ্ধদেবের কাছে এসে বললেন, 'প্রভু, আমার নির্বাণলাভের সময় হয়েছে।' বলে বুদ্ধদেবের আশীর্বাদ নিয়ে দেহত্যাগ করলেন। এতদিনে তাঁর কর্মফল ক্ষয় হল।

অঙ্গুলিমাল কিন্তু এঁদের মতো ভালমানুষ ছিলেন না। তিনি ছিলেন শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিতের পুরোহিতের ছেলে। তাঁর বাবা কোষ্ঠী গুণে জানতে পেরেছিলেন ছেলে বড়ো হয়ে ডাকাত হবে, মানুষ খুন করবে। তাই ঠিক করেছিলেন এমন ছেলেকে মেরে ফেলাই ভালো। দয়ালু রাজা প্রসেনজিৎ তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন। ছেলের নাম রাখা হল অহিংসক, মানে যে কাউকে হিংসে করবে না। বড়ো হয়ে অহিংসক তক্ষশিলায় পড়তে গেলেন। লেখাপড়ায় তিনি খুব ভালো। তাঁর অন্য সহপাঠীদের তাই খুব হিংসে হল। তারা গুরুমশায়ের কাছে নানারকম কথা লাগালে গুরুমশাই তাদের কথায় ভুলে অহিংসককে তাড়াবার জন্যে একটা উপায় বার করলেন। বললেন, 'বাবা অহিংসক তুমি যদি এক হাজারটা নরহত্যা করে তাদের একটা করে আঙুল দিয়ে আমায় একটা মালা তৈরি করে দাও তাহলে আমি তোমায় শিক্ষা দেব।'

এরপরই অহিংসক দস্যু হয়ে গেলেন। তিনি একটা বনে বসে থাকতেন। ঐ বনের ভেতর দিয়ে আটটা পথ আট দিকে গেছে। তখনকার দিনে তো এখনকার মতো গাড়ি-ঘোড়া ছিল না, সাধারণ লোক হেঁটে বা গরুর গাড়ি চড়েই বন পার হত। এই বনে লুকিয়ে থেকে অহিংসক মানুষ মারতেন আর তার আঙুল কেটে নিতেন। তাই তাঁর নামই হয়ে গেল অঙ্গুলিমাল। কোশল রাজ্যের লোক তাঁর নাম শুনলেই কাঁপত। প্রসেনজিৎ ঠিক করলেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে তিনি নিজেই যাবেন অঙ্গুলিমালকে মারতে।

এসময় বুদ্ধদেব জেতবনে থাকতেন। তিনি সব শুনে বললেন, 'এ জন্মে যাই করুক না কেন অঙ্গুলিমাল পূর্বজন্মে অনেক ভালো কাজ করেছে। একবার তার কানে ধর্মোপদেশ গেলে সে আর নরহত্যা করবে না।' কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? কে যাবে অঙ্গুলিমালকে ধর্মকথা শোনাতে? বুদ্ধদেব বললেন, 'আমিই যাব।' সবাই বারণ করলো। কিন্তু বুদ্ধদেব সামান্য ভিক্ষুর বেশে বনের পথে চললেন।

সেদিন পর্যন্ত অঙ্গুলিমালের ৯৯৯ জন মানুষ মারা হয়েছে। আর একজনকে

মারতে পারলেই হয়। তিনি ঠিক করলেন,'আজই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করব।' ওদিকে বুদ্ধদেব চলেছেন। অঙ্গুলিমাল তাঁর দিকে দৌড় লাগালেন। তিনি খুব ভালো দৌড়োতে পারতেন, হরিণ পর্যন্ত হেরে যেত। কিন্তু আজ আর তিনি বুদ্ধদেবকে ধরতে পারছেন না। ছ ক্রোশ দৌড়েও বুদ্ধদেবকে ধরতে না পেরে তিনি তাঁকে দাঁড়াতে বললেন। বুদ্ধদেব দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছো, সেখানেই থাকো আর এগিও না।' অঙ্গুলিমাল দাঁড়িয়ে রইলেন, তাঁর চলার শক্তিও ছিল না। বুদ্ধদেব দূরে দাঁড়িয়ে তাঁকে ধর্মোপদেশ দিতে শুরু করলেন। সেকথা শুনেই অঙ্গুলিমালের পূর্বজন্মের সব কথা মনে পড়ে গেল। তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। তিনি ভিক্ষু হয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে জেতবনে চলে এলেন।

এদিকে প্রসেনজিৎ সৈন্য সামন্ত নিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে এলেন প্রণাম করতে। বুদ্ধদেব বললেন, 'কি হয়েছে মহারাজ ?' রাজা বললেন, 'অঙ্গুলিমালকে দমন করতে যাচ্ছি।'

'যদি দেখা যায় অঙ্গুলিমাল ভিক্ষু হয়ে গেছে। তাহলে কি করবেন ?'

'তাহলে তাকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করব।'

বুদ্ধদেব রাজাকে অঙ্গুলিমালের কাছে নিয়ে গেলেন। অঙ্গুলিমাল জেতবনে আছেন শুনেই রাজার মুখ শুকিয়ে এল। কিন্তু অঙ্গুলিমাল তখন ভিক্ষু অহিংসক। তবু অঙ্গুলিমালের নাম শুনলেই লোকে ভয় পেত, তাঁকে ভিক্ষে দিতে চাইত না। অঙ্গুলিমাল নিজেও দুঃখ পেতেন শুধু শুধু অত নরহত্যা করার জন্যে কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'ওসব তোমার পূর্বজন্মের ঘটনা। ইচ্ছে করে তুমি একটাও প্রাণী- হত্যা করনি। এখন তোমার পুনর্জন্ম হয়েছে।'

অঙ্গুলিমালের মতো ডাকাতকে রাতারাতি ভিক্ষু বানিয়ে ফেললেও বুদ্ধদেব তাঁর খুড়তুতো ভাই দেবদত্তকে কোনদিন ভালো করতে পারেননি। কোন দেবদত্ত মনে আছে ? সেই যিনি ছোটবেলায় পাখির গায়ে তীর মেরেছিলেন, সেই তিনি। সারা জীবন তিনি বুদ্ধদেবের ক্ষতি করবার চেষ্টা করেছিলেন। দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষু হয়েও তিনি সবসময় কুমন্ত্রণা দিয়ে দিয়ে একদল ভিক্ষুকে বুদ্ধদেবের শত্রু করে তুলেছিলেন। দু-তিনবার বুদ্ধদেবের প্রাণ নাশের চেষ্টাও করেছিলেন। মহাভারত পড়েছো ? মহাভারতে যেমন দুর্যোধন যুধিষ্ঠিরকে দু চক্ষে দেখতে পারতেন না, দেবদত্তও সেইরকম গৌতম বুদ্ধকে দেখতে পারতেন না। মগধরাজ বিম্বিসার আর কোশলরাজ প্রসেনজিৎ দুজনেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন দেখে দেবদত্ত বিম্বিসারের ছেলে অজাতশত্রুকে নিজের দলে টানলেন। অজাতশত্রু

তখন যুবরাজ। তিনি দেবদত্ত ও তাঁর শিষ্যদের জন্যে একটা বিহার তৈরি করে দিলেন আর প্রতিদিন তাঁদের জন্যে খাবার পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। দেবদত্ত মোটামুটি নিশ্চিন্ত হয়ে বুদ্ধদেবের সঙ্গে একটা সন্ধি করতে চাইলেও বুদ্ধদেব তাঁকে সারিপুত্ত আর মৌদ্গল্যায়নের ওপরে স্থান দিতে রাজি হলেন না। অপমানিত দেবদত্ত প্রথমে অজাতশত্রুকে কুপরামর্শ দিয়ে বললেন বৃদ্ধ রাজা বিম্বিসারকে হত্যা করতে। অজাতশত্রু তাঁকে বন্দী করে খেতে না দিয়ে মারবেন ঠিক করলেন। তাঁর রাজ্যে বুদ্ধ উপাসনা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। তিনি বললেন, যে বুদ্ধের পুজো করবে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে।

দেবদত্তের মনে তবু সুখ নেই। তিনি রাজাকে বলে কয়ে কয়েকজন ভালো তীরন্দাজ চেয়ে নিলেন। ঠিক করলেন, এদের দিয়ে বুদ্ধদেবকে হত্যা করাবো, তারপর এদেরও মেরে ফেলব, তাহলে কেউ আমাকে ধরতে পারবে না। তীরন্দাজদের সর্দারকে তিনি বুদ্ধদেবের দিকে তীর ছুঁড়তে বললেন। সে বেচারা কিছুই জানে না কিন্তু যেই তীর ছুঁড়লো অমনি তীরটা সামনে না গিয়ে পেছনদিকে চলে গেল। অলৌকিক ব্যাপার দেখে তারা সবাই তীর ধনুক ফেলে বুদ্ধদেবের পায়েই লুটিয়ে পড়লো। দেবদত্ত কী করেন ? শেষে স্থির করলেন বুদ্ধদেব যখন গৃধ্রকূটের দিকে যাবেন তখন ওপর থেকে একটা বিশাল পাথর গড়িয়ে ফেলে তাঁকে পিষে মারবেন। ফেললেনও তাই। পাথরটা গড়াতে গড়াতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বুদ্ধদেবের পায়ের ওপর গিয়ে পড়লো শুধু একটি টুকরো। বুদ্ধদেবের কবিরাজ জীবক তখনই তাতে ওষুধ লাগিয়ে দিলেন। এখন উপায় ?

অজাতশত্রুর একটা বিশাল হাতি ছিল। তার নাম নালাগিরি। তার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি। দেবদত্ত ঠিক করলেন, বুদ্ধদেব যখন ভিক্ষায় বেরোবেন তখন নালাগিরিকে খাবারের সঙ্গে বিষাক্ত ওষুধ খাইয়ে পাগল করে পথে ছেড়ে দেওয়া হবে। মত্ত হাতি বুদ্ধদেবকে তুলে আছাড় মারবে। খবরটা বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্যরাও পেয়েছিলেন। তাঁরা তাঁকে সেদিন ভিক্ষায় বেরোতে বারণ করলেন। বুদ্ধদেব তাঁদের কথা শুনলেন না। যথাসময়ে নালাগিরিকেও ছাড়া হল। নালাগিরির সামনে প্রথমেই পড়ল একটি গরীবের মেয়ে, কোলে ছোট্ট শিশু। হাতি তাদের শুঁড়ে জড়িয়ে ধরতে যাচ্ছে দেখে বুদ্ধদেব বললেন, 'নালাগিরি, আমাকে মারবার জন্যে দেবদত্ত তোমাকে ওষুধ খাইয়েছে। তাই তুমি এমন মত্ত হয়েছ। আমি তো সামনে রয়েছি। তবে কেন ও বেচারিকে মারছো ?' এ কথা শুনেই নালাগিরি শুঁড় তুলে বুদ্ধদেবকে একটা লম্বা সেলাম করে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ল। যারা দেখছিল সবাই নালাগিরির প্রশংসা করতে করতে

সোনা-রুপোর যার যা গয়না ছিল নালাগিরিকে পরিয়ে দিল। নালাগিরির নতুন নাম হল ধনপালক। এবার দেবদত্তের খুব নিন্দে করতে লাগলো সবাই। রাজভবন থেকে তাঁদের যে খাবার আসত তাও বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর শিষ্যরাও তাঁকে ফেলে চলে গেলেন। দেবদত্ত নিজেই বেরোলেন ভিক্ষের জন্যে কিন্তু লোকে রাগ করে ঢিল ছুঁড়ে তাঁর ভিক্ষাপাত্র ভেঙে দিল। শোনা যায়, মৃত্যুর আগে দেবদত্ত বুদ্ধদেবের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, দেখা হয়নি। বুদ্ধদেব শুনে বলেছিলেন, 'দেবদত্ত আমার দেখা কিছুতেই পাবে না।' জেতবনে যাবার জন্যে দেবদত্ত যেই পালকি থেকে নেমে মাটিতে পা রেখেছিলেন অমনি ভূমিকম্পে মাটি ফেটে **ফাঁক** হয়ে গিয়েছিল, দেবদত্ত চলে গিয়েছিলেন সোজা নরকে।

তোমরা হয়তো বলবে দেবদত্ত শুধু শুধু ভিক্ষু হতে গেলেন কেন? রাজার ছেলে না হলেও সুখে ছিলেন তিনি। রাজপুত্রের মতো মানুষ হয়েছিলেন। হলে কি হবে? গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির দু-তিন বছর পরে বুদ্ধদেব হয়ে তিনি যখন রাজগৃহ বা রাজগির থেকে কপিলাবস্তুতে এলেন শুদ্ধোদন বাবা হয়েও রাজ্যের সকলের সঙ্গে বুদ্ধদেবকে প্রণাম করলেন। বুদ্ধদেবের প্রভাবে রাজসভার মধ্যেই বৃষ্টি পড়তে লাগলো। যার ইচ্ছে হল সেই বৃষ্টিতে ভিজলো, যার ইচ্ছে **হল** না তার গায়ে জল লাগলো না। অলৌকিক ঘটনা, সাধারণ বুদ্ধি দিয়ে যার মানে খুঁজে পাওয়া যায় না, সে রকম ঘটনা ঘটতে দেখলে সব মানুষই অবাক হয়, ভয়ও পায়। কারণ এই পৃথিবীর অনেক ঘটনার অর্থ তারা বোঝে না। তখনকার দিনে তো আরোই বুঝতো না। এখনকার দিনে কেউ যদি বলে 'আমি আকাশে উড়ে এলাম' তোমরা অবাক হবে না, তখন সবাই চমকে উঠত। তখন লোকে বুঝতে পারত না কেন সূর্য ওঠে, কেন বৃষ্টি হয়, কেন ফুল ফোটে, কেন ঝরনা নামে—প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান ছিল না। যার অর্থ বুঝতে পারত না তাকেই ভাবত দেবতা বা অপদেবতার কীর্তি। যাঁরা কোন অলৌকিক শক্তির অধিকারী হতেন তাঁদের সবাই ভয় করত, ভক্তিও করত। যুক্তিবাদী বুদ্ধদেব এসব ব্যাপারে বিশ্বাস করতেন না তবু তাঁর জীবনের সঙ্গে অনেক অলৌকিক ঘটনা জড়িয়ে আছে। সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ করা আজ আর সম্ভব নয়। আমরা সকলেই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারীকে বেশি শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি অথচ সত্যিকারের বড় সাধক এসব সিদ্ধাইকে খুবই অশ্রদ্ধা করেন। বুদ্ধদেবও অলৌকিক ঘটনাকে একটুও প্রশ্রয় দিতেন না; বলতেন, 'এসব আচার অনুষ্ঠান—ভুল। যা সত্য তাই শুধু থাকবে। মেঘ সরে গেলেই সূর্যের আলো ফুটে উঠবে। কোন কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কাজ করবে না, কোন পুরস্কারের

লোভেও নয়।' তাঁর কথা শুনে দলে দলে লোকে বৌদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। কপিলাবস্তুতে আসার পর তাঁকে প্রণাম করলেন তাঁর ছেলে রাহুল। বুদ্ধদেব নিজেই তাঁর ছেলের নাম রেখেছিলেন। শোনা যায়, তার জন্মসংবাদ পেয়ে সিদ্ধার্থ বলে উঠেছিলেন 'রাহুল জন্মেছে' কথাটার অর্থ আমার একটি নতুন বন্ধন হল। বৌদ্ধদের মতে তাই ছেলের নাম রাখা হল রাহুল। বুদ্ধদেব যখন কপিলাবস্তুতে এলেন রাহুলের বয়স তখন সাত বছর। তাঁর মা তাকে ভাল জামাকাপড় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'বাবা, ঐ যে ভিক্ষুশ্রেষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, উনি তোমার বাবা। যাও, ওঁকে গিয়ে বল, বাবা, ছেলে বাবার কাছ থেকে যে ধন পায়, আমাকে তা দাও।' রাহুল নির্ভয়ে গিয়ে বুদ্ধদেবের কাছে প্রণাম করে তার প্রার্থনা জানালো। প্রথমটায় বুদ্ধদেব বিরক্ত হলেন, ভাবলেন রাহুল তাঁর কাছে সেই ধন চাইছে যা সব অনর্থের মূল। তিনি তার কথায় কান না দিয়ে কোন কথা না বলে এগিয়ে চললেন। রাহুলও নাছোড়বান্দা। সে তাঁর পিছন পিছন চললো। তখন বুদ্ধদেব ভাবলেন, বোধিবৃক্ষের নিচে যে ধন আমি পেয়েছি একে আমি সেই ধনই দেব। তারপর নিজের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্তকে ডেকে বললেন, 'রাহুল পৈত্রিক ধন চাইছে। যে ধন দুঃখ নিয়ে আসে, তা তো আমি দিতে পারবো না। অতএব এর মাথা ন্যাড়া করে একে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস দান কর।' সারিপুত্ত সাত বছরের রাহুলের অঙ্গে পরিয়ে দিলেন ভিক্ষুর চীবর।

এই সময়েই কপিলাবস্তুর প্রায় সকলেই বৌদ্ধ হয়ে যান। শুদ্ধোদনের আর এক ছেলে ছিলেন নন্দ। তিনি গৌতমীর ছেলে, সিদ্ধার্থের সৎভাই। বুদ্ধদেবকে তিনি প্রণাম করতে এলে বুদ্ধদেব তাঁকে বলেছিলেন, 'আমাকে প্রণাম করতে হবে না, তুমি যেদিন পূর্ণ উদ্যমে সদ্ধর্ম পালন করবে আমি সেইদিন সুখী হব।' শোনা যায়, নন্দের বিয়ের দিনই বুদ্ধদেব তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করেন। এসময়েই আনন্দ, অনিরুদ্ধ ও অন্য শাক্যরাজকুমারদের সঙ্গে দেবদত্তও সন্ন্যাস নিয়েছিলেন বুদ্ধদেবের কাছে। মনে হয়, বুদ্ধদেবের খ্যাতির প্রতি ছিল তাঁর লোভ। ভেবেছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে তিনিও বুদ্ধের সমকক্ষ হবেন। ধ্যান করে নানারকম অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হলেও দেবদত্ত সিদ্ধাইয়ের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করতে যে পারেননি সে কথা তোমরা আগেই শুনেছো।

এক একবার মনে হয় তাহলে কি সবাই বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল? কত শিষ্য ছিল বুদ্ধদেবের? কেউ কেউ বলেছেন, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি' এই মন্ত্র উচ্চারণ করে কোটি কোটি লোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেছিল। কথাটা ঠিক কিন্তু সে অনেক পরের ব্যাপার। প্রথমে বুদ্ধদেব যখন একটি নতুন ধর্ম প্রচার করলেন তখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন

সেই পঞ্চশিষ্য। তাঁদের কথা আগেই বলেছি। এই শিষ্যদের তিনি যখন উপদেশ দিচ্ছিলেন তখন বারাণসীতে যশ নামে এক ধনী যুবক বাস করত। হঠাৎ সংসারের নানা ঝামেলায় বিরক্ত হয়ে সে ঋষিপত্তনে এসেছিল একটু শান্তি খুঁজতে। সেখানে এসে বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনে সে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। যশের চার বন্ধু বিমল, সুবাহু, পূর্ণজিৎ ও গবাংপতি যখন শুনলো যশ সন্ন্যাসী হয়ে বুদ্ধদেবের ভিক্ষু সংঘে যোগ দিয়েছে তখন তারাও ঋষিপত্তনে চলে এলো এবং বুদ্ধদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করল। অল্পদিনের মধ্যেই বুদ্ধদেবের সন্ন্যাসী শিষ্য-সংখ্যা হল দশজন। এই দশজনকে নিয়ে বুদ্ধদেব গয়ায় গেলে সেখানে কাশ্যপরা তিন ভাই—উরুবেলকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। তেরোটি শিষ্য নিয়ে বুদ্ধ এলেন রাজগৃহে। এখানে পেলেন সঞ্জয়ের আশ্রমের দুটি শিষ্য সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়ন। হাজার হাজার ভিক্ষুর কথা অনেক বইয়ে থাকলেও সে সবই মনে হয় বাড়িয়ে বাড়িয়ে লেখা হয়েছে। কেউ বলেছে এক হাজার, কেউ বলেছে দু-হাজার, কেউ বলেছে পাঁচ হাজার। দশ হাজার বারো হাজার ভিক্ষুর কথাও আছে, কিন্তু সব দিক ভেবে-চিন্তে মনে হয় বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের সময় পর্যন্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা পাঁচশোর বেশি হবে না। পরে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা অনেক বেড়েছিল। তার কারণ অন্যান্য সন্ন্যাসী সংঘের সাধুদের মতো বৌদ্ধ ভিক্ষুরা শুধু নিজেদের সাধন-ভজন নিয়ে থাকতেন না। তাঁরা সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের কথা ভাবতেন। তাই তাঁরা শুধু ভারতে নয়, সমস্ত এশিয়া মহাদেশে ছড়িয়ে পড়তে পেরেছিলেন। বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, 'লোকের মঙ্গলের জন্যে এবং সুখের জন্যে তোমরা চারদিকে যাও, একই রাস্তায় দুজন যেয়ো না।' বুদ্ধদেবের এই উপদেশ মেনে চলায় তাঁর ভিক্ষুসংঘ জনসমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মান পেয়েছিল। বুদ্ধদেবের বাণী ও উপদেশ ছড়িয়ে দেবার জন্যে তাঁরা নিজেরাও পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, নদী-সমুদ্র পেরিয়ে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। সে কথা পরে বলব। এখন আবার বুদ্ধদেবের কথায় আসি।

তাঁর মহাপরিনির্বাণ গ্রহণের কথা বলার আগে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্মের কথা একটু বলে নিই। তাঁর রাজকুমার জীবনের কথা নয়, সন্ন্যাসী জীবনের কথা। সাধারণত, তিনি ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে কিছুক্ষণ ধ্যান করতেন, কিংবা আশেপাশে একটু পায়চারি করতেন, তারপর সকাল হলে গ্রামের পথে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে বেরোতেন। সব জাতির মানুষের কাছ থেকে ভিক্ষা নিতেন। যে রান্না করা অন্ন বা ভাত পেতেন সব একসঙ্গে মিশিয়ে গ্রামের বাইরে গিয়ে খেয়ে নিতেন। তারপর একটু বিশ্রাম এবং ধ্যান। সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে বেরোতেন। বেড়াবার

সময় হন্‌হন্‌ করে হাঁটতে তাঁর মোটেই ভালো লাগত না। রাত্রিবেলা কোন মন্দির, কি ধর্মশালা কিংবা গাছের নিচে থাকতেন। রাত্রের প্রথম প্রহরে তিনি ধ্যান করতেন কিংবা পায়চারি। দ্বিতীয় প্রহরে নিজের পরনের ভেতরের কাপড়টি চার ভাঁজ করে মাটিতে পেতে শুয়ে পড়তেন। শোওয়ারও নিয়ম ছিল—মাথার নিচে হাত রেখে, ডান পাশ ফিরে ডান পায়ের ওপর বাঁ পা রেখে ঘুমোতেন। একে বলা হয় সিংহ-শয্যা।

বুদ্ধদেব খুব কম খেতেন, দিনে একবার মাত্র। এবং ভিক্ষুদের উপদেশ দিতেন একবার খাওয়ার জন্যে। বলতেন,'আমি রাত্রিবেলা খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি, তাতে আমার শরীরের রোগ ও জড়তা দূর হয়েছে। শক্তি বেড়েছে। মন শান্ত হয়েছে। তোমরাও যদি রাত্রে খাওয়া ছেড়ে দাও তাহলে তোমাদের শরীরে রোগ কম হবে, শক্তি আসবে। মনে শান্তি পাবে। অধিকাংশ বৌদ্ধমঠেই বোধহয় এ নিয়ম মেনে চলা হয়।

এ তো গেল প্রথমদিকের কথা। পরে যখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুদের সংঘে থাকতেন তখনও তাঁর নিয়মের খুব অদলবদল হয়নি। ভোরবেলা ধ্যান ও পায়চারি সেরে সকালে গ্রামে বা শহরে ভিক্ষায় বেরোতেন এবং পথ চলতে চলতে ও ভিক্ষে করবার সময় উপদেশ দিতেন। শোনা যায়, তিনি সিগালোবাদসুত্তের উপদেশগুলি রাস্তায় চলতে চলতে আর কসিভাবদ্বাজসুত্তের উপদেশগুলি ভিক্ষে করবার সময় দিয়েছিলেন। ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে যেটুকু ভিক্ষা প্রয়োজন সেটুকু নিয়েই তিনি চলে যেতেন গ্রামের বাইরে। কোনো গাছের নিচে বা ভালো জায়গায় বসে সেটুকু খেয়ে ফিরে আসতেন সংঘ বা বিহারে। সন্ধ্যাবেলা গৃহীরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন। যদিও বুদ্ধদেব নির্জনে থাকতে এবং কথা যতদূর সম্ভব কম বলতে চাইতেন, তবু তাঁর সঙ্গে শিষ্যরা প্রায়ই থাকত। বর্ষাকালের চার মাস তিনি যখন বিহারে বাস করতেন তখন থাকতেন আলাদা একটি ছোট্ট কুটিরে, এটিকে বলা হত গন্ধ-কুটি। বাকি আটমাস বুদ্ধদেব নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন। মাঝে মাঝে কিছুদিনের জন্যে নির্জনে বাস করতেন। তখন তাঁর কাছে একজন ভিক্ষু শুধু একবার খাবার দিয়ে আসবার জন্যে যেত। এমনকি ভিক্ষু সংঘেও তিনি বিশেষ গোলমাল পছন্দ করতেন না। একবার হয়েছিল কি, শোনো সে এক মজার ব্যাপার।

বুদ্ধদেব তখন চাতুমা গ্রামের আমলকীবনে থাকতেন। একদিন সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়ন অনেক ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে সেখানে এলেন। চাতুমার ভিক্ষুদের সঙ্গে তারা আলাপ-সালাপ করতে লাগলো। কোথায় শোওয়া হবে, কোথায় চীবর

রাখা হবে এইসব। কিছুক্ষণ পরে বুদ্ধদেব ভিক্ষু আনন্দকে ডেকে বললেন, 'জেলেরা মাছ ধরবার সময় হৈহুল্লোড় করে, তা এখানে সেরকম হট্টগোল হচ্ছে কেন ?'

আনন্দ বললেন, 'নতুন যে ভিক্ষুরা এসেছে তাদের সঙ্গে চাতুমার ভিক্ষুরা কথাবার্তা বলছে।' বুদ্ধদেব তাদের ডেকে শাস্তি দিলেন 'এখনি এখান থেকে চলে যাও।' নতুন ভিক্ষুরা মুখ চুন করে তাঁকে প্রণাম করে চুপচাপ চলে যাবার জন্যে রওনা হল। এদিকে চাতুমার ভিক্ষুরা নতুনদের থাকার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে দেখে সবাই চলে যাচ্ছে। অবাক হয়ে তারা জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ? চলে যাচ্ছ কেন ?' ভিক্ষুরা বলল, 'ভগবান আমাদের শাস্তি দিয়েছেন, তাই চলে যাচ্ছি।' চাতুমার ভিক্ষুরা তখন বুদ্ধদেবের কাছে গিয়ে ওদের জন্য অনুরোধ জানালে বুদ্ধদেব তাদের ক্ষমা করে সেখানে থাকার অনুমতি দিলেন।

বুদ্ধদেব যখন উপদেশ দিতেন তখনও সবাই চুপ করে বসে থাকতেন। তোমরা হয়তো ভাববে, সে আর এমন কি, আমরাও তো ক্লাসে চুপ করে বসে থাকি। বুদ্ধদেবের উপদেশের ক্লাসে বিরাট বুদ্ধসংঘের একটি মানুষেরও কথা দূরে থাক সামান্য হাঁচি বা কাশির শব্দটিও শোনা যেত না। অবশ্য শান্ত না হলে বুদ্ধদেবের কথা তারা শুনবে কি করে ? তাছাড়া বুদ্ধদেবও চাইতেন বিহারে সবাই শান্ত হয়ে থাকবে, যত কম কথা বলবে ততই ভালো। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংযম অভ্যাস করে তবেই তো নির্বাণের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। শুধু কথা বলতে হবে পরোপকার করবার সময়ে কিংবা উপদেশ দেবার জন্যে। এখনও অনেক দেশে এ নিয়ম মেনে চলা হয়। তোমরা যদি ঘরের পাশে ভুটানে যাও কোনদিন, সেখানে দেখবে লোকেরা খুব কম কথা বলে। বড় বড় জং বা বৌদ্ধ সংঘে চারশো পাঁচশো করে লামা থাকেন তাঁদের বয়স আট বছর থেকে আশি বছর, যাই হোক না কেন সবাই চুপ করে থাকে। একেবারে ছোট্টরা হয়ত জং ঝাঁট দিচ্ছে, তার চেয়ে বড়রা জংখা ভাষায় বিড় বিড় করে মন্ত্র মুখস্থ করছে, তাদের বড়রা থংকার ওপর মানে কাপড়ের ওপর রঙ তুলি দিয়ে ছবি আঁকছে বা ছুঁচ-সুতো দিয়ে কারুকাজ করছে—কিন্তু সবাই চুপচাপ। ভাবছ বুঝি তোমাদের সমবয়সী যারা, তারা এমন চুপচাপ হল কি করে ? এটা তাদের অনেক দিনের অভ্যাসে হয়েছে। যদিও তাদের সর্দার লামাদের হাতে রয়েছে চামড়ার চাবুক তবু মনে হয় সে চাবুক পিঠে পড়বার বড় একটা দরকার হয় না, সবারই চুপ করে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। যারা লামা নয় বাড়িতে থাকে স্কুলে পড়ে কিংবা অফিসে কাজ করে তারাও হৈ হৈ করে কথা বলে না, হিমালয় পাহাড়ের মতোই চুপ করে থাকে। তিব্বতের মানুষরাও এরকমই।

ধীরে ধীরে অনেকগুলো বছর কেটে গেল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের সময় এগিয়ে এল। তবু তাঁর ভ্রমণ বা ঘুরে বেড়ানো বন্ধ হল না। আগেই বলেছি তিনি ঘুরে বেড়াতেন প্রধানত উত্তর প্রদেশ ও বিহারে। কিন্তু তাঁর জীবনের তেইশটি বছরের কথা জানা যায় না। বিদেশী পর্যটকরা বলেন বুদ্ধদেব উড্ডীন, পুরুষপুর প্রভৃতি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলেও গিয়েছিলেন। সত্যি-মিথ্যে প্রমাণ হয়নি। সাধারণত তিনি মগধ, রাজগৃহ, অঙ্গরাজ্য, কোশল, শ্রাবস্তী, বারাণসী, চম্পা, মল্লরাজ্য, কৌশাম্বী প্রভৃতি জায়গায় বছরের আট মাস ঘুরে বেড়াতেন। চার মাস থাকতেন জেতবন, বেণুবন, ষষ্ঠীবন, মহাবন, আম্রবন প্রভৃতি কোন বনের মধ্যে তৈরি করা বিহার বা আশ্রমের গন্ধকুটিতে। আশ্রমগুলিকে বলা হত 'আরাম'। 'আরাম' শব্দটা আমাদের দেশেও আছে, অন্য দেশেও আছে। আমরা কথায় কথায় যে আরামের কথা বলি সেটি এসেছে ফারসী থেকে, তার অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিশ্রাম। ভারতীয় আরামের অর্থও প্রায় একই; যেমন বিশ্রামভবন, আনন্দ ইত্যাদি। বুদ্ধদেবের বিশ্রামভবন বলেই বোধহয় এদের নাম হয়েছিল 'আরাম'। জেতবনের অনাথপিণ্ডদক আরাম ছাড়াও বুদ্ধদেব ভক্ত বিশাখার 'পূর্বারামে' দুটো বর্ষা কাটিয়েছিলেন। কপিলাবস্তুতে ছিল ন্যগ্রোধআরাম, কৌশাম্বীর কাছে ঘোষিতারাম। এছাড়া ছিল কূটাগারশালা, সেখানেও তিনি বর্ষাকালে থাকতেন। বুদ্ধদেব জীবনের শেষ বর্ষাটি কাটিয়েছিলেন বৈশালীর বেলুবে। তারপর বেরোলেন কুশীনগরের উদ্দেশ্যে। আশি বছর বয়স, অতি বৃদ্ধ, পথে পাবার আম্রবনে রইলেন ক'টা দিন। সেখানে ভক্ত চুন্দ কর্মকার তাঁকে খেতে দিলেন শুয়োরের মাংস। বুদ্ধদেব অত্যন্ত কম খেতেন তবু এই সামান্য গুরুভোজনেই তাঁর শরীর আরো খারাপ হয়ে গেল। সেই অসুস্থ শরীরেই তিনি আবার পথ চলতে শুরু করলেন, কারণ তাঁর ভয় হল, এখানে তাঁর মৃত্যু হলে অন্য ভক্তরা চুন্দকে হয়ত বকবেন। সে বেচারা তো খারাপ হবে ভেবে তাঁকে খাওয়ায়নি, নিজের যা খাদ্য আদর করে তাই খেতে দিয়েছে গুরুদেবকে।

বুদ্ধদেব ধীরে ধীরে কুশীনগরে এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে তাঁর উপস্থায়ক ভিক্ষু আনন্দ। শোনা যায়, আনন্দ বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণের সময় পর্যন্ত সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন এবং মনপ্রাণ দিয়ে বুদ্ধদেবের সেবা করতেন। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যে যে ভিক্ষু আনন্দের কথা আছে, যিনি প্রকৃতির হাত থেকে জল খেয়েছিলেন, চণ্ডাল বলে তাকে একটুও ঘৃণা করেননি, তিনি এই আনন্দ। বুদ্ধদেব তাঁর কথা খুব শুনতেন। শোনা গেছে বুদ্ধদেবের ইচ্ছে ছিল না মেয়েরাও ভিক্ষুণী হয়ে তাঁদের সংঘে যোগ দেন। তাই তাঁর সৎমা, মহাপ্রজাবতী গৌতমী, যিনি তাঁকে পুত্রস্নেহে লালন করেছিলেন তাঁকেও ভিক্ষুণী হবার অনুমতি দেননি।

অথচ সবার মতো নারীদেরও তখন খুব ইচ্ছে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবার। স্বামীর মৃত্যুর পর গৌতমী কপিলাবস্তুতে বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করে ব্যর্থ হলেন। বুদ্ধদেব চলে গেলেন বৈশালীর কূটাগারশালায়। মহাপ্রজাবতী গৌতমী অন্তঃপুরের অনেক শাক্য নারীদের সঙ্গে নিয়ে একান্ন যোজন পথ পায়ে হেঁটে এলেন বৈশালীতে। যাঁরা রাজ অন্তঃপুরে থাকতেন, কখনো বাড়ি থেকে বেরোতেন না তাঁরা ধর্মের জন্যে ভিক্ষা করতে করতে এলেন বৈশালীতে। দেখে ভিক্ষু আনন্দর খুব কষ্ট হল। তিনি বুদ্ধদেবকে ভিক্ষুণী সংঘের জন্যে অনুরোধ জানালেন। এবার আর বুদ্ধদেব তাঁকে ফেরাতে পারলেন না, তাঁকে রাজি হতে হল। তোমরা প্রশ্ন করতে পারো, আনন্দ বুদ্ধদেবকে কি প্রশ্ন করেছিলেন ? কেন বুদ্ধদেব অনুমতি দিলেন ?

আনন্দ বুদ্ধদেবকে বলেছিলেন, 'আপনি যে ধর্ম সম্প্রদায় স্থাপন করেছেন তাতে ভিক্ষুণী হয়ে কোন নারী কি স্রোতআপত্তিফল, সকৃদাগামীফল, অনাগামীফল ও অর্হৎফল পেতে পারেন ?' এগুলো সবই হচ্ছে নির্বাণ বা মুক্তিলাভের এক একটা ধাপ বা সিঁড়ি। বুদ্ধদেব বললেন, 'হ্যাঁ পারে।' আনন্দ তখন বললেন, 'তাহলে যিনি আপনাকে মায়ের মতো যত্ন দিয়ে মানুষ করেছেন তাঁর অনুরোধে নারীদের সন্ন্যাস দিন।' এবার বুদ্ধদেবকে অনুমতি দিতেই হল।

এখানে রাহুলমাতা যশোধরার কথাও বলে নেওয়া যেতে পারে। বাঙালীরা তাঁকে বলেন গোপা। সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করে গেলে যশোধরাও নিজের ভালো ভালো পোশাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে সন্ন্যাসিনীর মতো জীবন কাটাতে লাগলেন। একবেলায় খেতেন, মাটিতে শুতেন। শুদ্ধোদনের মৃত্যুর পর মহাপ্রজাবতী গৌতমী যখন সংসার ত্যাগ করে চলে গেলেন তখন যশোধরা বিপুল সম্পত্তির মালিক হলেন। কিন্তু সন্ন্যাসিনীর জীবনই তাঁর কাম্য,তাই পায়ে হেঁটে তিনিও কপিলাবস্তু থেকে বৈশালীতে এলেন মহাপ্রজাবতী গৌতমীর কাছে এবং প্রব্রজ্যা নিয়ে ভিক্ষুণী হয়ে শ্রাবস্তীতে গেলেন বুদ্ধদেবের কাছে। যশোধরা স্থির করলেন তিনি শ্রাবস্তীতেই থাকবেন কিন্তু এখানে দেশের লোকে তাঁকে এত উপহার পাঠাতে লাগল যে তিনি বিরক্ত হয়ে বৈশালী চলে গেলেন। তারপর রাজগৃহে। যশোধরা আটাত্তর বছর বয়সে নির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধদেব হিরণ্যবতী নদী পার হয়ে পৌঁছলেন কুশীনগরে। তাঁর শরীর এখন জরাজীর্ণ। সেই প্রথম দেখা বৃদ্ধের মতো তাঁর শরীরটিও অশক্ত, রুগ্ন, বয়সের ভারে বেঁকে গেছে। কুশীনগরে পৌঁছে শালবনের মধ্যে দুটি শালগাছের মাঝখানে বুদ্ধদেবের শেষ শয্যা বিছিয়ে দিলেন আনন্দ, চোখের জল ফেলতে ফেলতে। বুদ্ধদেব উত্তরদিকে মাথা করে শুয়ে পড়লেন। ভারতবর্ষে উত্তর দিকে মাথা

রেখে দেহত্যাগ করার আরও উদাহরণ আছে। হরপ্পার ধ্বংসাবশেষে যে সব সমাধিতে মৃতদেহ পাওয়া গেছে, সেগুলিও উত্তর দিকে মাথা করে আছে। তার মানে মৃত্যুর পর মানুষের দেহটি উত্তরশিয়রী করে রাখা হত। বুদ্ধদেব নিজেই শুলেন, তবে যেমন-তেমন ভাবে নয়, সিংহ-শয্যায়। অবশ্য বুদ্ধদেব তথাগত শয্যা মানে ধ্যান করতে করতে সমাধিতে লীন হয়ে যাওয়াও পছন্দ করতেন। যাই হোক, অন্তিম শয্যায় শুয়ে তিনি আনন্দকে নানা রকম উপদেশ দিতে লাগলেন।

দীর্ঘ আশি বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন অনেক জায়গায়। শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ ও মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু ছিলেন তাঁর ভক্ত। অজাতশত্রুর নাম শুনে অবাক হচ্ছ নিশ্চয়, কারণ আমরা সবাই জানি, তিনি তাঁর রাজ্যে বুদ্ধপূজা নিষেধ করেছিলেন। রাজবাড়ির এক দাসী নাম তার শ্রীমতী সে আদেশ অমান্য করে বুদ্ধপূজা করে প্রাণ দিয়েছিল প্রাসাদরক্ষীদের হাতে। তাহলে ? আসলে অজাতশত্রু বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না। দেবদত্ত তাঁর মন বিষিয়ে দিয়েছিলেন প্রথমটায়। তাই তিনি তাঁর বাবা বিম্বিসারকে বন্দী করে রাজা হয়েছিলেন এবং রাজ্যে বুদ্ধপূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দেবদত্ত তাঁকে বলেছিলেন বিম্বিসারকে হত্যা করতে। অজাতশত্রু প্রথমে রাজি হননি। তারপর তাঁকে খেতে না দিয়ে অনাহারে হত্যা করেন। যেদিন বিম্বিসার কারাগারে অনাহারে মারা যান ঠিক সেদিনই অজাতশত্রুর পুত্র উদয়ভদ্রের জন্ম হয়। সন্তানের জন্ম সংবাদ পেয়ে তিনি খুব আনন্দ পেলেন আর তখনই তাঁর মনে হল 'আমি যেদিন জন্মেছিলাম আমার বাবাও কত আনন্দ পেয়েছিলেন। আর সেই বাবাকে কিনা আমি বন্দী করে অনাহারে রেখে দিয়েছি।' তখনই তিনি ছুটে গেলেন কারাগারে। কিন্তু তার আগেই বিম্বিসার মারা গেছেন। অনুতাপে বুক ফেটে যেতে লাগল অজাতশত্রুর। দেবদত্ত প্রথমটায় অনেক চক্রান্ত করলেন। কিন্তু যত দিন যায়, অজাতশত্রুর মনে দুঃখ বাড়তেই থাকে। অনেক সাধু সজ্জনের কাছে উপদেশ শুনলেন তবু শান্তি হয় না। শেষে বৈদ্য জীবকের পরামর্শে অজাতশত্রু বুদ্ধদেবের শরণ নিয়ে শান্তি পেলেন। তাই বলছি, বড় বড় তিন রাজা বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছিলেন। এছাড়া ছিল বৈশালী, কৌশাম্বী, অঙ্গ ও আরো অনেক রাজ্যের ধনী-দরিদ্র অগণিত মানুষ। শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদও যেমন ছিলেন তেমনি দরিদ্র ভিখারিণীও ছিলেন, যিনি নিজের পরনের একমাত্র কাপড়খানিও ভিক্ষুকে দান করতে পেরেছিলেন। তবু এই দীর্ঘ সময়ে কেউ বুদ্ধদেবের ছবি আঁকেনি, মূর্তি গড়েনি। তাঁকে নিয়ে লেখেনি এমন কোন বর্ণনাত্মক কাব্য যাতে তাঁর চেহারার নিখুঁত বর্ণনা পাওয়া যায়। যাঁরা সংঘ তৈরি

করবার জন্যে কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা খরচ করলেন তাঁরা তাঁদের প্রিয় গুরুদেবের একটি মূর্তিও তৈরি করালেন না।

কেন ?

অনেকেই বোধহয় প্রস্তাব করেছিল। অনুরোধ জানিয়েছিল বুদ্ধদেবকে। কিন্তু বুদ্ধদেব নিজেই বারণ করেছিলেন তাঁদের। নাম-যশের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র লোভ ছিল না। এই নশ্বর শরীরটাই যখন দুদিন পরে ধ্বংস হয়ে যাবে তখন তার ছবি এঁকে কি লাভ হবে ? কোন স্থায়ী জিনিস হলে না হয় হত। তাই তিনি কেবলই বলতেন, 'এই নশ্বর দেহটার ছবি এঁকে, মূর্তি গড়ে তাকে চিরস্থায়ী রূপ দেবার কোন দরকার নেই। যা ধুলোয় মিশিয়ে যাবে তাকে ধুলো হয়ে যেতে দাও। আমার পুজো না করে প্রণাম না করে তোমরা যদি সদ্‌ধর্ম পালন করে নিজেদের উন্নতি কর তাহলেই আমি সুখী হব।'

নিজের সমাধি বা স্তূপ নির্মাণেও বুদ্ধদেবের আপত্তি ছিল। আগেকার দিনে রাজারা বা ধনী ব্যক্তিরা মারা গেলে তাঁদের সমাধির ওপরে ইট পাথর দিয়ে প্রকাণ্ড ঢিবি বা স্তূপ করা হত। হিন্দুরা মৃতদেহ মাটির নিচে পুঁতে রাখত না, পুড়িয়ে দিত কিন্তু তারাও সেই চিতার ওপরে একটা মঠ বা মন্দির তৈরি করত। এ প্রথাটা মনে হয় অল্পবিস্তর সব দেশেই ছিল। মিশরের পিরামিডের কথা তোমরা জানো। আসলে পিরামিড বা স্ফিংস যাই হোক না কেন সবই ছিল রাজাদের সমাধি। মেক্সিকোর স্টেপ পিরামিডও তাই। তবে মিশরের পিরামিড হত ত্রিভুজ পাহাড়ের মতো। ভারতের স্তূপ সাধারণত হত গোল, আধখানা বলের মতো। আরো নানা রকম আকারও দেখা যেত না তা নয়, এখনও তোমরা পুরনো কোন জায়গায় বা শ্মশানের ধারে তুলসী মঞ্চের মতো ছোট ছোট স্তূপ দেখতে পাবে। তার কোনটায় হয়তো লেখা আছে কারোর নাম, কোনটায় কিছুই নেই। নিদেন পক্ষে একটা পাথরে নাম লিখেও লাগিয়ে দেওয়া হত। খ্রীস্টান ও মুসলমানদের কবরের কথা সকলেই জানো, দেখেছো। খ্রীস্টানদের সমাধিতে থাকবে ক্রুশ। কোথাও কারুকাজ করা থামের ওপর, সঙ্গে মৃত ব্যক্তির নাম ধাম পরিচয়। ব্রাহ্মদের সমাধিও এই ধরনের হয়, সেখানে ক্রুশের বদলে লেখা থাকে ওঁ। মুসলিমদের কবরের ওপরেও নানারকম স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়। তাজমহল তোমাদের অনেকেই দেখেছো। শাহজাহান ও মমতাজমহলের সমাধি, দেখবার জন্যে দেশ-বিদেশের লোকে আসে। তিব্বত, ভুটান, লাড়াখ ও আরো অনেক জায়গায় আছে চোরতেন, নিচে সমাধি, ওপরে নানা মাপের মন্দির, রাজা হলে বড়ো, গরীব হলে ছোট্ট সরার মতো একটি গোল পাথরে লেখা হয় 'ওম্ মণিপদ্মে হুম'—এ অবশ্য এখনকার কথা। তবে সর্বত্রই এরকম

স্মৃতিসৌধের কথা শোনা যায়। কোথাও তার নাম চৌপ, কোথাও দাগোবা, কোথাও প্যাগোডা কোথাও বা দীপৌলদীন। এখন এগুলি প্রধানত বৌদ্ধরাই তৈরি করেন এবং সেগুলো মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আগে তা হত না। রাজার সমাধি বা স্তূপে ভক্তরা এবং প্রজারা ফুল ও মালা নিশ্চয় দিতেন, প্রতিদিন পুজো করতেন না।

ভিক্ষু আনন্দই চোখের জল ফেলতে ফেলতে বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাঁর নির্বাণলাভের পর দেহাবশেষের কি হবে ? তার ওপর স্তূপ নির্মাণ করা হবে তো। শেষ মুহূর্তে বুদ্ধদেব আর বারণ করতে পারলেন না। তিনি স্তূপ নির্মাণ করার অনুমতি দিয়েও বললেন, 'তোমরা নিজেদের জন্যে যত্ন করো, নিজেদের জন্যে চেষ্টা করো। তাতেই আমি সুখী হব। আমার দেহের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় গৃহস্থরাই করবে। ভিক্ষুদের কিছু করতে হবে না।'

তারপর ধ্যানের মধ্যেই তিনি নির্বাণলাভ করলেন। তাঁর দেহের ওপর ঝরে পড়লো রাশি রাশি শালফুল। সাত দিন তাঁর দেহটিকে রেখে দেওয়া হল। হিউয়েন সাঙ ভারতে এসে শুনেছিলেন হাজার টুকরো কাপড় জড়িয়ে তাঁর দেহটি শবাধারে রেখে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ সংগ্রহ করবার জন্যে অজাতশত্রু রাজা এলেন। এলেন আরো ধনী-মানী ব্যক্তি। শহরের বাইরে নদীর ধারে মরদেহ দাহ করা হয়েছিল। তারপর সেখান থেকে সবাই জোগাড় করলেন অস্থি বা হাড়ের টুকরো। আটজন রাজা বুদ্ধদেবের অস্থি ভাগ করে নিলেন। কেউ সংগ্রহ করলেন অস্থি, কেউ নখ কেউ-বা দাঁত। হিউয়েন সাঙ যখন এসেছিলেন,বুদ্ধদেবের নির্বাণলাভের প্রায় হাজার বছর পরে, তখনও শুনেছিলেন কোন লোক যদি সত্যিকারের বিশ্বাস নিয়ে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা জানিয়ে খোঁজে তাহলে সেই শ্মশান থেকে বুদ্ধদেবের কোন না কোন পবিত্র হাড় পাবেই। এই হাড়ের আকার চালের মতো ছোট ছোট। এভাবেই অস্থি সংগ্রহ করতেন অনেকে।

অস্থি নিয়ে গিয়ে রাজারা বড় বড় স্তূপ তৈরি করলেন, স্তূপের মাঝখানে বাক্স বা কৌটোয় দামী পাথরের মতো রইল অস্থি। আটজন রাজা আটটি স্তূপ তৈরি করেছিলেন। তারও আগে শোনা যায় বুদ্ধদেবের কাছ থেকে কেশগুচ্ছ চেয়ে নিয়ে গিয়ে স্তূপ তৈরি করেছিলেন তপুসা এবং বল্লুকা নামে কলিঙ্গের দুই বণিক। কলিঙ্গ হচ্ছে উড়িষ্যা। যাই হোক, বুদ্ধদেবের অস্থি নিয়ে যে আটটি স্তূপ তৈরি হল সেগুলি ছিল রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, আল্লাকাপ্পা, রামগ্রাম, বেথাদীপ, পাবা ও কুশীনগরে। পরে সম্রাট অশোক এসব স্তূপের অস্থি নিয়ে তৈরি করেছিলেন আরো চুরাশি হাজার স্তূপ। হাজার বাদ দিয়ে চুরাশিটা স্তূপ তৈরি

করলেও তার সংখ্যা কম বলা যায় না। পুরনো স্তূপের একটাও কোথাও অবশিষ্ট নেই।

বুদ্ধদেবের স্মৃতিরক্ষার জন্যে তাঁর অস্থি সংগ্রহ এবং স্তূপ তৈরি করেই বুদ্ধভক্তরা কাটিয়ে দিলেন অনেক দিন। বুদ্ধদেবের অস্থি নিয়ে তাঁরা কেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন সে গল্পও দু একটা তোমাদের শোনাবো। তাতে তোমরা বুঝতে পারবে ধর্ম নিয়ে আমরা, মানে সব ধর্মের লোকেরাই কি রকম বাড়াবাড়ি করে নিজের ধর্মকে সবার সেরা বলে প্রমাণ করতে চাই। বৌদ্ধরাও চাইতেন। বুদ্ধদেবের সময়ে নয়, তাঁর মৃত্যুর পরে। আমাদের মনে রাখতে হবে অন্যান্য ধর্মের তুলনায় হিন্দু ধর্ম অনেক পুরনো। খ্রীস্ট ধর্মের বয়স দু হাজার বছর হয়নি। বৌদ্ধধর্ম বড় জোর আরও কয়েক শো বছরের বড়ো। এই নতুন ধর্ম হিন্দু ধর্মের সঙ্গে পাল্লা দেবে কি করে ? তাই বৌদ্ধরা বললেন, গৌতম বুদ্ধের আগে আরও চব্বিশ জন বুদ্ধ ছিলেন, ছিলেন অনেক বোধিসত্ত্ব ও প্রত্যেক বুদ্ধ, এঁরা বুদ্ধত্ব লাভ করেন শুধু নিজের জন্যে, পরের মঙ্গলের জন্যে চিন্তা করেন না। হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মতো তাঁদেরও অনেক দেবতা আছে। এসব অবশ্য বেশ পরের কথা। যখন বৌদ্ধরা দুভাগ হয়ে গেছেন—একদল হীনযানপন্থী, অপরদল মহাযানপন্থী। হীনযানপন্থীরা মূর্তি পুজোয় বিশ্বাস করতেন না। মহাযানপন্থীরা মূর্তিপুজো করতেন এবং বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর পুজো করতেন। কিন্তু মূর্তিপুজো তো পরের ব্যাপার। আগে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ বা অস্থি পূজার বিবরণ শোনো। একে বলা হত 'নরবু' বা অমূল্য রত্ন।

ফাহিয়েন যখন ভারতে আসেন তখন নগরহার রাজ্যের হিলোতে এসে শুনলেন সেখানকার একটি বিহারে বুদ্ধদেবের অস্থি রাখা আছে। তিনি ভক্ত মানুষ। সুদূর চীন থেকে এসেছেন বুদ্ধদেবের দেশে। ফাহিয়েন ভারতে এসেছিলেন ৩৯৯ সালে। চীনে তখন বৌদ্ধ ধর্মের জোয়ার এসেছে। মিং রাজা ৬১ খ্রীস্টাব্দে স্বপ্নে দেখেছিলেন বুদ্ধদেবকে। পণ্ডিতদের পরামর্শে বুদ্ধদেবের দেশ থেকে বৌদ্ধ সাধুদের নিয়ে আসবার জন্যে দূত পাঠিয়েছিলেন ভারতে। মগধ থেকে দুই পণ্ডিত কাশ্যপ মাতঙ্গ ও ধর্মরক্ষ চীনে যান দূতেদের সঙ্গে ৬৫ সালে। তখন থেকেই চীনের সাধুরা ভারতে আসছেন। কেউ পথেই মারা যান, কেউ ভারতের সংঘারামে থেকে যান, আবার কেউ ফিরে যান। ফাহিয়েন ফিরে গিয়ে লিখেছিলেন ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

নগরহার রাজ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি আছে শুনে খুব উৎসাহ নিয়ে দেখতে গিয়েছিলেন ফাহিয়েন। দেখলেন সে এক বিরাট ব্যাপার। অস্থিটি আগাগোড়া

সোনা দিয়ে মোড়া, তার ওপরে সাতটি হীরে-মানিক বসানো। অস্থিটি রক্ষা করবার জন্যে অনেক ব্যবস্থা নেওয়া হত। শহরের আটজন বিশিষ্ট নাগরিকের ওপর এই বিহার রক্ষার ভার ছিল। তাঁরা প্রতিদিন সন্ধেবেলা বিহারের দরজা বন্ধ করে নিজের নিজের মোহরের ছাপ দিয়ে যেতেন। পরদিন সেই সীলমোহর ঠিক আছে কিনা দেখে নিয়ে তবে তালা খোলা হত। তালা খোলার পর সোনার সিংহাসনে বসতেন অস্থি। সঙ্গে সঙ্গে কাড়া-নাকাড়া বেজে উঠত। রাজা পুব দুয়ার দিয়ে এসে সোনার সিংহাসনে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে পশ্চিম দুয়ার দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে বসতেন রাজার আসনে। অন্য লোকেরাও সবাই অস্থি প্রণাম করে দিনের কাজ শুরু করতেন। এই ছিল সেখানকার নিয়ম। ছিল বলছি কারণ এখন আর নেই। ভারতের পশ্চিমদিকের সব দেশেই ইসলাম ধর্ম ছড়িয়ে পড়ায় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব শেষ হয়ে গেছে।

হিউয়েন সাঙ ভারতে এসেছিলেন ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে। ফাহিয়েনের দুশো বছর পরে। এখানে ছিলেন প্রায় চোদ্দ বছর। তিনিও অনেক কিছু দেখেছিলেন। নগরহার রাজ্যে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন বুদ্ধদেবের মাথার হাড় বা অস্থি। এই অস্থি দেখতে হলে দর্শককে দিতে হত একটি স্বর্ণমুদ্রা। আর তার ছাপ নিয়ে যেতে চাইলে পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা। বড্ড চড়া দাম হলেও অনেকেই দেখতে আসত। আর একটা স্তূপে হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন বুদ্ধদেবের চোখের মণি, আমের মতো বড়ো উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ। আর অনেক মঠেই ছিল বুদ্ধদেবের নখ, চুল ও হাড়। বুদ্ধ পূর্ণিমায় বন্ধু জয়সেনের সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন বুদ্ধগয়ায়। সেখানকার স্তূপে দেখলেন অস্থিগুলো বেশ বড়ো বড়ো মুক্তোর মতো। দেখে ফিরে এসে নিজের জায়গায় বসেছেন তখন জয়সেন বললেন, 'আপনি তো অনেক অস্থি দেখেছেন, সবই চালের দানার মতো ছোট ছোট। তাহলে এখানকারগুলো এত বড়ো বড়ো হল কি করে?' হিউয়েন সাঙের মনেও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তাঁরা দেখলেন একটা নির্দিষ্ট সময়ে বিহারের সব আলো নিবে গেল আর যেখানে অস্থি ছিল সেই স্তূপ থেকে আলোর শিখা বেরোতে লাগল। পাঁচ রঙা আলো সার্চ লাইটের মতো কয়েকবার ঘুরে-ফিরে মিলিয়ে গেল। একটা মিষ্টি গন্ধ পেলেন ঘ্রাণে। সকলে হৈহৈ করে উঠলো, 'শরীর তার অলৌকিক ক্ষমতা দেখাচ্ছে।' 'শরীর' হচ্ছে অস্থি।

হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, যে সব স্তূপে বুদ্ধদেবের অস্থি ছিল সব জায়গা থেকেই জ্যোতি বেরুতো। বিশেষ করে সম্রাট অশোকের তৈরি করা স্তূপ ও বিহার থেকেই এরকম জ্যোতি বা আলো দেখানো হত। আলো যে অস্থি থেকে বেরুতো না তা নিশ্চয় বুঝতে পারছ। লোকে অলৌকিক জিনিস দেখে অবাক

হত বলেই এসব ব্যবস্থা করা হত। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর প্রথম কয়েকশো বছর এভাবেই কেটে গেল। বুদ্ধদেব নিজে তো কিছুই লিখে যাননি তাই তাঁর শিষ্যরা রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় সমবেত হয়ে নিজেরাই তাঁর উপদেশ আবৃত্তি করে তা প্রচারের ভার নেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হয় প্রথম ধর্মসঙ্গীতি। যাঁরা বুদ্ধদেবকে দেখেছিলেন তাঁরাও সকলেই মারা গেলেন। কাজেই বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন সেকথাও ভুলে গেল সবাই।

প্রায় দুশো বছর পরে মগধের সিংহাসনে বসলেন সম্রাট অশোক। ইতিহাসে তোমরা তাঁর কথা অনেক পড়েছ। প্রথম জীবনে তিনি খুব নিষ্ঠুর হলেও কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ানক মারামারি দেখে তাঁর মনের পরিবর্তন হয় এবং তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডাশোক পরিণত হন ধর্মাশোকে। বৌদ্ধধর্ম প্রচার করে এবং অহিংসা দিয়ে তিনি বিশাল সাম্রাজ্য জয় করেন। দিকে দিকে স্থাপন করেন অশোক স্তম্ভ ও পালিভাষায় লেখা বুদ্ধের অনুশাসন। পুরনো স্তূপ থেকে দেহাবশেষ সংগ্রহ করে তার ওপর তিনি তৈরি করেন আরো বহু স্তূপ। সংখ্যাটা শুনলেও ভয় করে ৮৪,০০০। অশোক স্তম্ভ পাওয়া গেছে সারনাথে, এর মাথার ত্রিসিংহ হচ্ছে ভারতীয় যুক্তরাজ্যের প্রতীক। এই স্তম্ভের ধর্মচক্রটিই আমাদের জাতীয় পতাকায় রয়েছে। স্তূপ ছাড়াও অশোক তৈরি করিয়েছিলেন চৈত্য। চৈত্য শব্দটা এসেছে চিতা থেকে। হিন্দুরা তো মৃতদেহকে পোড়াতো, তারা চিতার ওপর নির্মাণ করত চৈত্য। পরে স্মৃতিচিহ্ন হিসেবেও চৈত্য তৈরি করা হত। আসলে স্তূপ ও চৈত্য একই জিনিস, দুটির আকার আলাদা।

সম্রাট অশোকের সময়েই দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধর্মসঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। তৃতীয় সভার অনুষ্ঠানের পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের কাজে মনোনিবেশ করেন। শোনা যায়, এ সময় থেকেই বৌদ্ধ সংঘ নানা শাখায় ভাগ হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দুশো বছর কেটে গেছে বলে বৌদ্ধধর্মেও দেখা দিয়েছে শিথিলতা বা মত ও পথের পার্থক্য। আঠারোটা শাখায় ভাগ হয়ে গেলেও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান শাখাদুটি হল হীনযান ও মহাযান। হীনযানপন্থীরা মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী নন। মহাযানপন্থীরা মূর্তিপূজা করেন এবং আরো অন্যান্য দেবদেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। ক্রমে মহাযান ভেঙে হয় বজ্রযান, সহজযান ও কালচক্রযান। তন্ত্র-মন্ত্রের সঙ্গে যোগ বেশি থাকায় এঁদের বলা হয় বৌদ্ধতান্ত্রিক। অনেকে মনে করেন হিন্দুদের কালীঠাকুর এসেছেন বৌদ্ধতান্ত্রিক তারাদেবী থেকে।

সম্রাট অশোক নিজে হীনযানপন্থী ছিলেন। এবং তিনি শান্তির দূত হিসেবে হীনযানী সাধুদের নানা জায়গায় পাঠালেন। লঙ্কা বা সিংহলে গেলেন অশোকের

পুত্র মহেন্দ্র। রাজা-সুদ্ধ হাজার হাজার মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। রানী অনুলারও ইচ্ছে হল প্রব্রজ্যা নেবার। তাঁকে প্রব্রজ্যা দেবার জন্যে মহেন্দ্রর বোন সংঘমিত্রাও গেলেন সিংহলে। এর অনেক পরে বুদ্ধদেবের একটি পবিত্র দাঁত নিয়ে যাওয়া হল সিংহলে। তার ওপর তৈরি হয় স্তূপ বা দাগোবা। সিংহলের স্তূপগুলো খুব বড়ো। রুয়েনবেলি দাগোবার ব্যাস ২৫৪ ফুট। তবে এ স্তূপটি খুব উঁচু ছিল না। এর মধ্যে ছিল রুপোর তৈরি সোনার পাতে মোড়া বোধি বৃক্ষ এবং সোনার বুদ্ধমূর্তি। পরে অবশ্য স্তূপটি ধ্বংস হয়ে গেছে। অভয়গিরি দাগোবার ব্যাসও কম নয়, ৩২৭ ফুট আর উচ্চতা ২৭০ ফুট। ভারতের সবচেয়ে বড় অমরাবতী স্তূপও এত বড় নয়, তার ব্যাস ছিল ১৯২ ফুট আর উচ্চতা ছিল ১০০ ফুট।

সম্রাট বর্মা, শ্যামদেশ প্রভৃতি জায়গাতেও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পাঠিয়েছিলেন। ফলে সে সব দেশেও বৌদ্ধধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। বর্মার শুধুমাত্র পাগানেই তৈরি হয় ১০০০ প্যাগোডা বা স্তূপ। এসব অবশ্য অশোকের সময়ের নয়, অনেক পরে। রেঙ্গুনের শোয়েডাগন প্যাগোডার নাম শুনেছ বোধহয়। এটা তৈরি করা হয়েছিল একটা ছোট পাহাড়ের ওপর। মাটি থেকে শিখরের উচ্চতা কম নয়, ১৪,০০০ ফুট। এর গায়ে লাগানো আছে ২৫ টন সোনার ও ১০০ টন রুপোর পাত। স্তরে স্তরে পাহাড়টির গা কেটে তৈরি হয়েছে আরো কয়েকশো ছোট-বড়ো স্তূপ। এই স্তূপের ভেতরে আছে বুদ্ধদেবের মাথার চুল।

স্তূপ নির্মাণে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন জাভার শিল্পীরা। বোরোবুদুরের স্তূপের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে পাহাড়পুরের স্তূপটির। কিন্তু পাহাড়পুরের স্তূপ এখন ভেঙে গেছে। বোরোবুদুর দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে লোকে যায়। বিস্তৃত এক মালভূমির ওপরে এই বিশাল স্তূপটি পরপর নটি স্তরে নির্মাণ করা হয়েছে। নিচের ছটা স্তর বা তলা চৌকো, ওপরের তিনটি স্তর গোল। সবচেয়ে নিচের চতুষ্কোণটির বিস্তার ৩৯৫ ফুট, সবার ওপরের বৃত্তটির পরিধি ৯০ ফুট। ওপরের তিনটি গোল স্তূপের প্রত্যেক বৃত্ত-পরিধিতে আবার অনেকগুলো স্তূপ আছে, সেগুলিতেও আছে একটি করে উপবিষ্ট ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। সমস্ত মন্দিরটিতে বুদ্ধমূর্তির সংখ্যাই ৪৩২টি। এছাড়া জাতকের ছবি আঁকা ১৫০০ প্যানেল বা খিলান। সব মিলে কল্পনা করে নাও এবার। সম্রাট অশোক যেখানে যেখানে দূত পাঠিয়েছিলেন সেখানে হীনযানেরই প্রসার হয়। তাঁরাও শেষে বুদ্ধমূর্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, তবে অন্যান্য দেবদেবীকে মেনে নেননি।

এভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বার সময়েই বৌদ্ধ ভক্তরা অনুভব করেছিলেন বুদ্ধদেবের মূর্তি এবং ছবি থাকলে অনেক ভালো হত। যত দিন যায়, নিষেধের

ফাঁসগুলোও তত আলগা হয়ে আসে। একদল মানুষ ভাবতে লাগলেন, বুদ্ধদেবের মূর্তি না হয় নাই গড়া হল তাঁর জীবনের ঘটনাগুলোকে যদি পাথরের বুকে ছেনি হাতুড়ি দিয়ে এঁকে রাখা যায়, ক্ষতি কি ? ভারহুত ও সাঁচীর স্তূপ তৈরি করিয়েছিলেন ধনী ব্যবসায়ীরা। তাঁরা স্থির করলেন স্তূপের তোরণ বা গেটে এবং অন্যান্য জায়গায় বুদ্ধের জীবনের ঘটনা এঁকে রাখা হবে। কিন্তু যাঁর মূর্তি গড়া হবে না তাঁর জীবনচিত্র আঁকা হবে কি করে ? ভেবে ভেবে শিল্পীরা ঠিক করলেন, কপিলাবস্তুতে বুদ্ধের আবির্ভাব যেখানে বোঝানো হবে সেখানে আঁকা হবে হাতি কিংবা গৌতমের মা মায়াদেবী স্বপ্নে দেখছেন একটা হাতিকে। আঁকা মানে ছবি আঁকা নয়, পাথরের ওপর ছেনি হাতুড়ি দিয়ে রূপ ফুটিয়ে তোলার কথা বলছি। যাইহোক, এরপর গৌতম বুদ্ধের জন্ম বোঝাতে হলে আঁকা হবে পদ্মফুল ও বৃষ। হয় যে কোন একটা,নয় দুটোই। গৌতমের গৃহত্যাগ বোঝানো হবে দরজা এবং ঘোড়া এঁকে। যেন দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঘোড়ায় চেপে চলে গেছেন তিনি। গয়া বা উরুবিল্বে বুদ্ধত্ব লাভের জন্যে তপস্যা বোঝানো হবে বোধিবৃক্ষের নিচে বেদী তৈরি করে। বেদী অবশ্য খালি থাকবে, ধরে নিতে হবে এখানে বুদ্ধদেব বসে আছেন কিংবা উপদেশ দিচ্ছেন। চারপাশে লোক, হাতজোড় করে বসে বা দাঁড়িয়ে রয়েছে। সারনাথে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করেন বলে এর প্রতীক হল চক্র এবং হরিণ। আর কুশীনগরে মহানির্বাণলাভের প্রতীক স্তূপ তো আছেই। অনেকটা সমস্যা মিটলো। ভারহুত, সাঁচী আর অমরাবতীর স্তূপে এসব প্রতীকের সঙ্গে সঙ্গে পাথরের বুকে আঁকা হল অনেক লতাপাতার নকশা, বুদ্ধদেবের চরণচিহ্ন আর জাতকের গল্প। বুদ্ধদেবের জীবনের নানা ঘটনা। তার দু একটা তোমাদের আগেই বলেছি যেমন রাজগৃহে নালাগিরি হাতির বুদ্ধদেবের পায়ে লুটিয়ে পড়া কিংবা জেতবন বিহারে সুদত্তর সোনার মুদ্রা বিছিয়ে বাগান কেনার কথা। এরকম আরো অনেক গল্পের ছবি পাথরের বুকে এঁকে রাখতে পেরে শিল্পীরা যেমন খুশি হলেন তেমনি আনন্দ পেল দর্শকেরা। সাধারণ মানুষের কাছে শুধু মুখে বলে আর কতটা বোঝানো যায় ? আমাদের সবচেয়ে বড় ইন্দ্রিয় হচ্ছে দুটি চোখ। চোখে দেখলে অনেকটা কল্পনা করা যায়। বিশ্বাসও হয়। এখনও তোমরা সাঁচীতে গেলে কিংবা দিল্লীর জাদুঘরে রাখা অমরাবতীর পাথরে দেখতে পাবে বুদ্ধদেবের জীবনচিত্রের প্রতীকচিহ্নগুলিকে। 'ভারহুতের তোরণগুলো আছে কলকাতার জাদুঘরের বিরাট একটা হলঘর জুড়ে। তোমাদের মনে হচ্ছে নিশ্চয় এসব জিনিস তাদের নিজের নিজের জায়গায় না থেকে দিল্লী বা কলকাতার জাদুঘরে এলো কেন ? উত্তরটার খানিকটা তোমরাও নিশ্চয় জানো। পুরনো যুগের যা কিছু নিদর্শন মাটি খুঁড়ে বা অন্য উপায়ে পাওয়া যায়

সবই সংগ্রহ করে কোন না কোন জাদুঘরে রাখা হয়।সেটাই সব দেশের নিয়ম।

এখন প্রশ্ন, পুরনো দিনের সে সব স্তূপ গেল কোথায় ? সেই হাজার হাজার স্তূপ ? চীনা পরিব্রাজকেরা এসে দেখেছিলেন সুন্দর সুন্দর মন্দির। কোথায় গেল ? ভারতের বেশিরভাগ স্তূপ, শুধু স্তূপ কেন মন্দিরও ভেঙে যেত পুরনো হলে। লোকে তখন সেখান থেকে ইট খুলে নিয়ে গিয়ে নিজেদের বাড়ি বানাতো, উনুন বানাতো, রাস্তা বানাতো, সেতু বানাতো। এভাবেই ভারহুত ও অমরাবতীর স্তূপ ভেঙে গেছে। সারনাথের স্তূপের ইটপাথর দিয়ে বরুণা নদীর সেতু হয়েছে, তার আগে পিপারওয়া ও অহিচ্ছত্রের স্তূপও ধ্বংস হয়েছে ? পিপারওয়ার স্তূপে পাওয়া গেছে বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ। এভাবে ভারতের অনেক সুন্দর সুন্দর স্তূপ, মন্দির এবং মূর্তি হারিয়ে গেছে। এখনও যাচ্ছে। আমরা সবাই যদি একটু সচেতন হই তাহলে হয়তো অনেক কিছু রক্ষা পেতে পারে। অনেক গ্রামেই দেখা যায় গাছতলায় কি ছোট্ট একটা মন্দিরে রয়েছে একটা মূর্তি। কলকাতার কাছেই একটা শীতলা মন্দিরে এখনও পড়ে আছে একটা বিরাট বুদ্ধমূর্তি। কি করে এলো কেউ জানে না। কিসের মূর্তি কেউ জানে না। অনেক ক্ষেত্রেই যে বসায়, বা যে সিঁদুর লেপে তারা কিছুই জানে না। কত অবহেলায় অযত্নে এসব মূর্তি নষ্ট হয়ে যায় তা জানো ? এক জায়গায় পুকুরঘাটের একটা সিঁড়ি হয়ে পড়ে ছিল একটা বড়ো মূর্তি। এগুলো খুঁজে বার করে জাদুঘরে পাঠিয়ে দেবার দায়িত্ব তোমাকে আমাকে সকলকেই নিতে হবে। জাদুঘরের কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে ওঁরা ছুটে আসেন নিজে থেকেই। কিন্তু সারা দেশের গ্রাম ও শহরের আনাচে-কানাচের খবর তাঁদের কে দেবে তোমাদের মতো উৎসাহী ছেলেমেয়েরা ছাড়া। এখনও পর্যন্ত অনেক কিছুই খুঁজে পাওয়া গেছে শুধু ছোটদের কৌতূহল ও আগ্রহের জন্যে। আলতামিরা গুহায় আঁকা আদিম মানুষের ছবি কিংবা বাইবেলের সবচেয়ে পুরনো পাণ্ডুলিপি খুঁজে বার করেছিল কয়েকটি কিশোর, সেদিন তারা বুঝতেও পারেনি কত মূল্যবান তাদের আবিষ্কার, ইতিহাসের কতগুলো ছেঁড়া পাতা তারা খুঁজে পেল। যাক আবার ফিরে আসি পুরনো কথায়।

কেটে গেছে আরো কয়েক বছর। বৌদ্ধধর্মের প্রচার বাড়ছে। পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতেও একে একে গড়ে উঠেছে নানা ধরনের চৈত্য ও গুহামন্দির। কানহেরি, কার্লে, ভাজা, বেডসা, পিতলখোরা, নাসিকের পাহাড়ের গুহা কেটে কেটে তৈরি হয়েছে অজস্র কৃত্রিম গুহা। তার ভেতরে চৈত্য, প্রার্থনাসভা, মূর্তি, মন্দির। অজন্তা ও ইলোরা তৈরি হয়েছিল অনেক গুহা। অনেকে এদের গোম্ফাও বলেন, তবে তিব্বত বা ভুটানে যে সব গোম্ফা আছে সেগুলো পাহাড় কেটে তৈরি হয়নি। সেদেশে গোন্‌পা মানে নির্জনতা। নির্জন পরিবেশে রয়েছে

বলে মন্দির হয়েছে গোম্ফা। শুধু বৌদ্ধরা নয় জৈন সাধুরাও পাহাড় কেটে গুহা তৈরি করতেন। এলোরায় হিন্দুদের গুহাও আছে। বৌদ্ধরা গুহায় বেশির ভাগই আঁকতেন জাতকের ছবি। তার আগে থেকেই মূর্তি গড়া শুরু হয়েছিল।

সম্রাট অশোক যেমন হীনযানপন্থী রাজা ছিলেন তেমনি শক রাজা কণিষ্ক ছিলেন মহাযানপন্থী বৌদ্ধ। পুরুষপুর বা পেশোয়ারে ছিল তাঁর রাজধানী। চীন থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত মহাযানপন্থী বৌদ্ধরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা আর আগ্রহে। তিনিও তৈরি করালেন বিশাল বিশাল স্তূপ ও বিহার। আফগানিস্তান, কাবুল, কান্দাহার, বামিয়ান, ফনদুকিস্তান, মিরান, পেশোয়ার কণিষ্কের অধীনে যত দেশ ছিল সর্বত্র তৈরি হল বুদ্ধদেবের বিগ্রহ। উড্ডীন বা অরগ্যান দেশ বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের সেরা তীর্থ হয়ে উঠল। অন্যান্য স্থানের চেয়ে সঙ্কাস্য অর্থাৎ বুদ্ধদেব স্বর্গের দেবতাদের জয় করে যেখানে নেমে এসেছিলেন সেই কাল্পনিক জায়গাটির মাহাত্ম্য বৃদ্ধি পেলো। এ সময় থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ছড়িয়ে পড়ে চীন, জাপান, নেপাল, ভুটান, তিব্বত, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে। দূরে দূরে পাড়ি দিলেন মহাযানপন্থীরা। তাই এসব দেশে মহাযানপন্থী ধর্মই প্রভাব বিস্তার করল। আজও এসব দেশে মহাযানী ধর্মই চলে আসছে। আগেই বলেছি, মহাযানীদের মূর্তিপুজোয় আপত্তি ছিল না। তাছাড়া শিল্পীরা বোধিসত্ত্বমূর্তি গড়ার কাজেও হাত দিচ্ছিলেন। এবার বোধিসত্ত্ব সম্পর্কে দুটো কথা বলে নিই।

সাধারণত বোধিসত্ত্ব বলা হয় বুদ্ধদেবের বুদ্ধত্ব অর্জনের আগের অবস্থাকে। অর্থাৎ তাঁর জীবনের প্রথম ঊনত্রিশ বছরকে বলা যায় বোধিসত্ত্ব অবস্থা। পরে জাতকের গল্পগুলোকে বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কথা ধরে নিয়ে বলা হত সে গল্পগুলিতেও রয়েছেন বোধিসত্ত্ব। কখনও রাজপুত্র, কখনও বৃক্ষদেবতা, কখনও কপিরাজ বানর আবার কখনও গজরাজ হয়ে। এইভাবে বোধিসত্ত্বের সংখ্যা বাড়তে লাগলো কারণ বোধিসত্ত্ব বুদ্ধ নন, তার আগের অবস্থা, সুতরাং সংখ্যা বাড়াতে ক্ষতি কি? বোধিসত্ত্বের ছবি আঁকাও শুরু হল একটি-দুটি করে। সকলেরই তখন ইচ্ছে বুদ্ধদেবের মূর্তি তৈরি হোক। হিন্দুরা নানা দেবদেবীর পুজো করছে আর তাঁরা করতে পারবেন না? তাছাড়া কার অনুসরণ করছেন তাঁরা? কাকে সামনে রেখে এগোবেন সে কথাও তো ভাবতে হবে।

যাঁরা মূর্তি-পুজোর চল্ শুরু করেছিলেন তাঁরা অনেক ভেবেচিন্তেই করেছিলেন। কোন একজনকে ধ্যান করে পুজো করে তাঁর পথকে আঁকড়ে ধরে থাকতে হলে মনের মধ্যে তাঁর সম্বন্ধে একটা ধারণা থাকা চাই। অথচ ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ নয়। সে একটা সুনির্দিষ্ট কোন বস্তুকে দেখতে চায়। দেবমূর্তি সেই ধারণারই বস্তুরূপ। সাধনার উন্নত

স্তরে উঠলে মানুষের জীবনে আর মূর্তিপুজো করবার দরকার হয় না। যাঁরা সেই স্তরে পৌঁছে গেছেন তাঁরা সবাইকে মূর্তিপুজো করতে বারণ করেন। বুদ্ধদেবও করেছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার সাধারণ মানুষ কি করে বুঝবে তাঁর কথা? তারা তো তাঁর মতো উচ্চ স্তরে ওঠেনি। তারা বিপদে পড়ে এদিক-ওদিক করে। একবার শরীর বা 'অস্থি'র আলো দেখে চমকে ওঠে, একবার বুদ্ধদেবের ভিক্ষাপাত্র দেখতে ছোটে, আবার একবার স্তূপের গোড়ায় মাথা ঠোকে।

ঠিক কবে প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা হল তা বলা সম্ভব হবে না। মূর্তি বিশেষজ্ঞদের মতে সবার আগে বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেন গান্ধারের গ্রীক শিল্পীরা। গ্রীক রাজা মিলিন্দ বৌদ্ধ হয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে গ্রীসের যোগাযোগও ছিল। কাজেই **গ্রীক শিল্পীরা** এদেশে আসতেন। তাঁরাই প্রথম বুদ্ধমূর্তি নির্মাণের ভার পেলেন। গ্রীসে-রোমে তখন মূর্তি তৈরি হত, কাজেই গ্রীক শিল্পীরা বেশ উৎসাহ নিয়ে কাজে হাত দিলেন। কিন্তু তাঁরাই বা মূর্তি তৈরি করবেন কি করে? কেউ তো বুদ্ধদেবকে দেখেননি। যাঁরা দেখেছিলেন তাঁরাও কেউ বেঁচে নেই। মহা মুশকিল। বুদ্ধদেব কাল্পনিক দেবতা নন, তিনি মানুষ হয়েও মহামানব। এসব ভেবেই তো ভারতীয় ভাস্কররা কাজে হাত দেননি, বুদ্ধদেবের নিষেধ তো ছিলই। সবচেয়ে বড়ো অসুবিধে হল তাঁকে ঠিক কেমন দেখতে ছিল সে সম্বন্ধে কিছু না জানা। কিন্তু কাজে হাত দিয়ে তো বসে থাকা যায় না, দেখাই যাক একবার চেষ্টা করে।

প্রথম বুদ্ধমূর্তি কোনটি সে নিয়ে অনেক গল্প শোনা গেছে। শুনিয়েছেন ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ। চোদ্দশো -পনেরোশো বছর আগে তাঁরা শুনেছিলেন ভারতে এসে। ফাহিয়েন লিখেছেন, প্রথম বুদ্ধমূর্তি তৈরি করেন শ্রাবস্তীর রাজা প্রসেনজিৎ। বুদ্ধদেব তখন তিন মাসের জন্যে 'তুষিত' স্বর্গে তাঁর মা ও অন্যান্য দেবতাদের ধর্মকথা শোনাতে গিয়েছিলেন। তাঁকে অনেকদিন দেখতে না পেয়ে রাজা চন্দনকাঠ দিয়ে অবিকল তাঁর মতো দেখতে একটি মূর্তি তৈরি করে সেটিকে বুদ্ধদেবের বেদীতে বসিয়ে রাখলেন। তারপর বুদ্ধদেব সঙ্কাস্য নগরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ফিরলেন জেতবনে। তাঁকে দেখে কাঠের মূর্তি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রণাম করলে বুদ্ধদেব তাকে বললেন, 'আমার নির্বাণলাভের পর তুমিই আমার প্রতীক হয়ে থাকবে, এখন তুমি যেখানে ছিলে সেখানে ফিরে যাও।' তাঁর কথা শুনে মূর্তি নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায়। ফাহিয়েনের মতে প্রসেনজিতের তৈরি করা মূর্তিটিই প্রথম বুদ্ধমূর্তি। তিনি এ মূর্তি দেখেছিলেন।

ফাহিয়েনের দুশো বছর পরে এসেছিলেন হিউয়েন সাঙ। তিনি শুনেছিলেন প্রথম বুদ্ধমূর্তিটি তৈরি করেন কৌশাম্বীর রাজা উদয়ন। গল্পটা একই। বুদ্ধদেব

তাঁর মাকে ধর্মকথা শোনাবার জন্যে 'তুষিত' স্বর্গে গিয়েছিলেন। তিন মাস কেটে গেছে। রাজা উদয়ন মৌদ্‌গল্যায়নকে অনুরোধ জানিয়ে এক শিল্পীকে স্বর্গে পাঠান। সেই শিল্পী স্বর্গে বুদ্ধদেবকে দেখে এসে ঠিক তাঁর মতো একটি মূর্তি তৈরি করেন এবং সেই মূর্তিটি বুদ্ধদেব ফিরে এলে তাঁকে প্রণাম জানায়। হিউয়েন সাঙ লিখেছেন, পুরনো রাজপ্রাসাদের মধ্যে ৬০ ফুট উঁচু এক বিহারে বুদ্ধমূর্তিটি আছে। অনেক রাজাই এ মূর্তিটি জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, পারেননি। তাই তাঁরা এর নকল গড়িয়ে তার পুজো করেন আর বলেন, 'এটাই আসল মূর্তি।' হিউয়েন সাঙ জেতবনের মূর্তি, যেটির কথা ফাহিয়েন লিখেছেন, সেটাও দেখেছিলেন এবং লিখেছেন উদয়ন মূর্তি তৈরি করেছেন শুনে প্রসেনজিৎ আর একটি মূর্তি গড়েন। তার মানে এ মূর্তিটি প্রথম নয়। হিউয়েন সাঙ যখন এসেছিলেন তখন ভারতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। ভিক্ষুরা চলে গেছেন। সংঘারাম খালি। অর্ধেক বিহার ভেঙে গেছে। ভাঙাচোরা পরিবেশের মধ্যেই পড়ে ছিল প্রসেনজিতের বুদ্ধমূর্তি।

এ দুটি গল্প শুনে বোঝা গেল বুদ্ধদেবের মূর্তি যখন প্রথম তৈরি হল তখন সবাই বলতে লাগলেন মূর্তিটি বুদ্ধদেবকে দেখেই তৈরি করা হয়েছিল। হিউয়েন সাঙ আরেকটা মূর্তি দেখেছিলেন গয়ায়। শুনেছিলেন, সেখানে এক বিহারে বুদ্ধমূর্তি গড়বার জন্যে ডাক পড়লো দেশবিদেশের শিল্পীদের কিন্তু কেউ বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের মুহূর্তটিকে ফোটাতে পারলেন না। শেষে এক ব্রাহ্মণ এসে মূর্তি গড়লেন এবং তখন শোনা গেল তিনিই ছিলেন স্বয়ং বুদ্ধদেব। একথা ঠিক, চীনা পরিব্রাজকদের এদেশে আসার অনেক আগে থেকেই এদেশে বুদ্ধমূর্তি গড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল তবু তাঁরা সবচেয়ে পুরনো যে মূর্তিদুটি দেখেছিলেন সে দুটিই ছিল কাঠের। আমরা সবচেয়ে পুরনো যে বুদ্ধমূর্তি পেয়েছি সেগুলো সবই গান্ধারের ভাস্কররা তৈরি করেছিলেন। তাঁরাও চেষ্টা করছিলেন বুদ্ধদেব যেমনটি দেখতে ছিলেন ঠিক তেমনই মূর্তি গড়তে। তাই প্রথমে গ্রীক দেবতাদের মতো মোটাসোটা হৃষ্টপুষ্ট ধরনের বুদ্ধমূর্তি গড়লেন। বৈদিক যুগের হিন্দু দেবতাদের তো কোন মূর্তি পাওয়া যায়নি। তৈরি হত কিনা তাও জানা যায়নি। তাছাড়া তাঁরা দেবতা আর বুদ্ধদেব মানুষ। কাজেই গ্রীক দেবতার অনুকরণ করে গান্ধারের শিল্পীরা যে বিরাট অপরাধ করেছিলেন তা নয়। দেখা গেল বুদ্ধমূর্তির মাথায় পরিপাটি চুল, গায়ে বর্মের মতো জামা, মুখে হাসি। কেউ তৈরি করলেন গোঁফ ও লম্বা চুলওয়ালা বুদ্ধ। তাঁর পায়ে জুতো। ফনদুকিস্তানের ভাস্কর বুদ্ধদেবকে গড়লেন যোদ্ধার বেশে। বামিয়ানে বালি পাথরের দুটো বিশাল মূর্তি তৈরি হল, একটার উচ্চতা ১৭৫ ফুট আর একটার উচ্চতা ১২০ ফুট। বোঝো

একবার ! সতেরো-আঠারো তলা বাড়ির মতো উঁচু হবে প্রথমটা আর দ্বিতীয়টা বারো তলার কম হবে না। এখনও এ মূর্তি ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে সেদেশের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। আর একদল শিল্পী আবার শাস্ত্র-টাস্ত্র দেখে তপস্যার সময় বুদ্ধদেবের যেমন চেহারা হয়েছিল সেই রূপ ফুটিয়ে তুলতে চাইলেন। আসলে বুদ্ধদেব খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। কিন্তু তপস্যা করতে করতে, উপোস করতে করতে তাঁর শরীর খুব রোগা হয়ে গিয়েছিল। শরীরের সবকটা হাড় গোনা যেত। একথা সারিপুত্তকে বুদ্ধদেব নিজেই বলেছিলেন। সিকরি বিহারে পাওয়া গেছে এমনই একটি অস্থিচর্মসার কঙ্কালের মতো বুদ্ধমূর্তি।

এসব মূর্তির একটাও ভারতীয়দের পছন্দ হল না। দেবতা বা দেবতার মতো মানুষের এরকম মূর্তি গড়া ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রের মতে অনুচিত। শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী দেবতাদের মূর্তি হবে পনেরো বছরের সুকুমার তরুণের মতো, তাঁর কান-দুটি হবে আকারে অনেক বড়, কারণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের কান বড় হয়, তাঁর দুই পায়ের দ্বিতীয় আঙুলটি হবে সবচেয়ে দীর্ঘ ইত্যাদি। ভারতে দেবমূর্তি গড়ার এই নিয়ম। তোমরা দু একটা কৃষ্ণ বা বিষ্ণুমূর্তি দেখলেই বুঝতে পারবে আমার কথা। এঁদের মুখে কোথাও বয়সের ছাপ পড়েনি, মুখে শিশুর মতো সারল্য অথচ বেশ মহিমান্বিত ভাব। গান্ধার শিল্পীদের বুদ্ধমূর্তিতে এসব কিছুই নেই। বুদ্ধদেবের পেশীবহুল ব্যায়ামপুষ্ট শরীর কিংবা অনাহারে শরীরপাত করা কঙ্কালসার মূর্তি কোনটাই মনের মতো হল না। তবে বোধিসত্ত্ব মূর্তি পেয়ে সকলেই বেশ খুশি হলেন। চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বত সর্বত্র বোধিসত্ত্ব মূর্তির খুব আদর। আমাদের বাংলাদেশেও অনেক বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। বেশির ভাগের মাথায় মুকুট। ছোট ছোট বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্ব মূর্তি মন্দিরে দিতেন ভক্তরা। তাতে পুণ্য হত। যার যেমন সাধ্য সে তেমনি একটি মূর্তি, সে পাথর বা টেরাকোটা যাই হোক, মন্দিরে দিয়ে যেত। ধনীরা দিতেন সোনা-রুপো বা পেতলের মূর্তি। হিউয়েন সাঙ তামার ৮০ ফুট উঁচু মূর্তিও দেখেছিলেন। আর একটা তামার মূর্তি তৈরি হয়েছিল মোম গলানো বা লস্ট ওয়াক্স পদ্ধতিতে। বড়ো বড়ো সোনার মূর্তিও কম ছিল না। সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমান আকারের একটা সোনার বুদ্ধ ছিল একটা বিহারে আর তিন ফুট উঁচু সোনার বুদ্ধমূর্তি নিয়ে নগর পরিক্রমা হত।

গান্ধার শিল্পীদের সমসাময়িক ছিলেন মথুরার শিল্পীরা। তাঁরা ভালো মূর্তি তৈরি করতেন। তাঁদের তৈরি করা যক্ষিনী মূর্তি দেখলে এখনও চোখে ধাঁধা লাগে, এত সুন্দর বলে। তাঁরাও বুদ্ধমূর্তি তৈরি করলেন। তার মুখ চোখ অনেকটা ভারতীয়ের মতো মনে হলেও ঠিক ভক্তি হয় না। এ যেন যক্ষদের

মতোই একজন মানুষ। ভারতীয় বিশেষজ্ঞরা বলেন, যক্ষমূর্তি থেকেই বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল। পার্খামে যে যক্ষমূর্তি পাওয়া গেছে সেটিই নাকি অজাতশত্রুর তৈরি করা প্রথম বুদ্ধমূর্তি। তাঁদের কল্পনায় বুদ্ধদেব যক্ষদের মতো দেখতে ছিলেন। যক্ষ-যক্ষী কথাটা শুনে তাদের নতুন কিছু ভেবো না। আগেকার দিনে মন্দিরের দরজায়, তোরণে, দেয়ালে অনেক যক্ষমূর্তি দেখা যায়—এই যক্ষরা হল সেকালের ধনী সমাজের মানুষের প্রতীক। বুদ্ধদেব নিশ্চয় ধনী রাজপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন কিন্তু মানুষ হয়েও তিনি মহামানব। মথুরার বুদ্ধদেবের মাথায় কোঁকড়া চুল নেই। চোখ খোলা, মুখে হাসি, বসে থাকার ভঙ্গিতেও রয়েছে একটা কেউকেটা ভাব। মথুরার শিল্পীরা বুদ্ধের দাঁড়ানো এবং বসা দুই ভঙ্গিতেই মূর্তি গড়লেন। মূর্তির পায়ের কাছে বসে রইল একটা সিংহ।

কেন? একটা সিংহ বুদ্ধের পায়ের কাছে বসে থাকবে কেন তার কৈফিয়ৎ শিল্পীরা স্পষ্ট করে না দিলেও আমরা শুনেছি ধ্যানী বুদ্ধমূর্তির পায়ের কাছে থাকত তাঁর বাহন। বুদ্ধদেবের বাহন সিংহ হবে কেন সে কথায় পরে আসছি। আগে অজন্তা গুহার কথাটা সেরে নিই। দক্ষিণ ভারতে পাহাড়ের গায়ে গুহা তৈরি করে সেখানে চুন, গোবর ও মাটির প্রলেপ লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকতেন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। শোনা যায়, ৯০০ বছর ধরে এখানে ছবি আঁকা হয়েছে। গুহার সংখ্যাও কম নয় ত্রিশটি, তার মধ্যে ষোলোটি গুহায় ছবি ছিল। এখন অবশ্য মাত্র দশটিতে ছবি আছে। অন্যগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। অজন্তায় বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এঁকেছিলেন বুদ্ধদেবের জীবনকথা এবং জাতকের নানা গল্প। তোমাদের মনে হতে পারে, এত ছবি আঁকার কী দরকার ছিল? সাধন-ভজন ছেড়ে এঁরা বুদ্ধদেবের ছবি আঁকতে বসলেন কেন? যে কাজ করতে বুদ্ধদেব নিষেধ করেছিলেন, সেই কাজ করলেন কেন? যাঁরা মূর্তি তৈরি করেছিলেন তাঁরা হয় রাজা, নয় কোন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ছবি এঁকেছিলেন শুধু সন্ন্যাসীরা। নিশ্চয় তার কোন কারণ ছিল।

তা ছিল বইকি। প্রাচীনকালে বইপত্র বেশি ছিল না। পুঁথিপত্র যা ছিল তার সংখ্যা এত বেশি নয় যে চাইলেই হাতের কাছে পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষের বই পড়বার সময় বা সুযোগ কোনোটাই ছিল না। কিন্তু ছবি দেখে তারা শিখতে পারতো। তাদের ধর্মশিক্ষা দেবার জন্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ছবি আঁকার দিকে ঝুঁকেছিলেন। বিজন বনে, গহন অরণ্যে পাহাড়ের গা কেটে গুহা বানিয়ে সেখানে এঁকে রাখতেন নানারকম ছবি। তখন হয়তো আরো অনেক আঁকা হয়েছিল, অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়ে গেছে বেশির ভাগ ছবিই। বর্ষার জল লেগেছে অবিরত। মানুষেও কি কম নষ্ট করেছে? তৈরি করা গুহা পেয়ে সাধুরা এসে আশ্রয় নিয়ে

ধুনি জ্বালিয়ে ছবি কালো করেছেন। আর যুদ্ধের সময় সৈন্যরা এসব গুহাকে রান্নাঘরের উপযোগী মনে করে উনুন ধরিয়ে অনেক ছবির দফা রফা করে দিয়েছে। এরপর আছেন উৎসাহী দর্শকেরা। পকেট থেকে ছুরি বার করে কেটে কেটে নিজের নাম সই করে ভেবেছেন তাঁর নামটা এবার চিরস্থায়ী হল। এখন রক্ষা পেয়েছে অজন্তার দশটা গুহা ও বাগ গুহার পাঁচটা গুহা। দক্ষিণ ভারতে আরো অনেক মন্দিরে ছবি আঁকা আছে। সেগুলো হিন্দু ও জৈনদের আঁকা। মনে হয় তাঁরা বৌদ্ধদের দেখে ছবি আঁকতে শিখেছিলেন। মন্দিরের পর্দা প্রভৃতিতেও ছবি আঁকা হত।

অজন্তার **বোধিসত্ত্বকে** তোমরা অবশ্যই ভালো করে দেখো। এমন সুন্দর ছবি আর কোথাও নেই। এটি হল সিদ্ধার্থের ছবি—সন্ন্যাসী হবার আগের রূপ। রাজপুত্রের মতো সাজপোশাক, মাথায় মুকুট, হাতে বালা, বুকে সোনার পৈতে, কানে কুণ্ডল, কপালে টিপ, গলায় মুক্তোর মালা। নিজের হাতে ধরা একটি ফুলের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। ফুলের দিকে কি? ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখবে বুদ্ধদেবের চোখের দৃষ্টি উদাস, করুণ। ফুলের দিকে তাকিয়ে থাকলেও তাঁর চোখের পেছনে রয়েছে যে মন, সেই মন চলে গেছে অনেক দূরে। এই ছবি যে সিদ্ধার্থ ছাড়া কারোর হতে পারে না, সেকথা সবাই বুঝতে পারবে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আরো একটা কারণে ছবি আঁকার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তোমরা আগেই জেনেছো বুদ্ধদেব তাঁর শিষ্যদের নতুন নতুন পথে যেতে বলেছিলেন। রাজারা যখন প্রচারকদের পাঠাতেন তখন ভিক্ষুরা সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন পুঁথিপত্র ও আরো অনেক কিছু। কিন্তু নিজেরা সামান্য সম্বল হাতে নিয়ে যখন বিদেশে পাড়ি দিতেন তখন কি করতেন ? তখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন দুটি একটি কাপড়ে বা কাগজে নানা রঙ দিয়ে আঁকা বুদ্ধদেবের জীবনচিত্র। নতুন দেশের ভাষা বোঝেন না, কি করে বোঝাবেন তাদের ? তাছাড়া পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে নদী-নালা ডিঙিয়ে তাঁদের যেতে হত। সে পথে বেশি পুঁথিপত্রের বোঝা বয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না। কি করে নতুন দেশে ধর্মপ্রচার করবেন ? তাই ছবি সঙ্গে নিয়ে যেতেন। হালকা জিনিস হাতে হাতে চলে যাবে অনেক দূর। গেলও। সেইসঙ্গে ছবি আঁকার ধারাটিও গেল তাঁদের সঙ্গে।

লামা তারানাথ বলেছেন বৌদ্ধধর্ম প্রসার যেখানে সম্ভব হয়েছে সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন দক্ষ সংঘশিল্পীরা। বৌদ্ধবিহারে ভিক্ষুরাও ছবি আঁকা শিখতেন। তাঁরা সেই প্রতিভা নিয়ে দেশবিদেশে গিয়ে সেখানকার ভিক্ষুদের আঁকতে শেখাতেন। এভাবেই তিব্বত, নেপাল ও ভুটানে অজস্র ছবি আঁকা হয়েছে। কাপড়ে আঁকা ছবিকে বলা হয় থংকা। লাসায়, লাডাখের হেমিস

গুম্ফায়, পারোর জাদুঘরে বিশাল বিশাল থংকা আছে। এক একটা দোতলা, আড়াইতলা বাড়ির সমান লম্বা।

থংকা ছাড়াও আছে প্রচুর গুহাচিত্র ও দেওয়াল চিত্র। ভারতের অজন্তার মতো চীনের টুং হুয়াং গুহায় আঁকা রয়েছে অজস্র ছবি। টুং হুয়াং-এ কটা গুহা আছে জানো ? এক হাজার। তার মধ্যে চারশো আশিটা বেশ ভালো অবস্থায় রয়েছে। বাকিগুলো ভেঙে গেছে। সেকালের বাণিজ্যপথ চীন থেকে মধ্য এশিয়া যাবার রাস্তার নাম ছিল সিল্করোড। রেশম ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের পথ বলেই হয়েছিল এ নাম। এরই ধারে ধারে দুপাশে গড়ে উঠেছিল অজস্র বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার। টুং হুয়াং তার মধ্যে একটি। বামিয়ান ও মিরানেও বুদ্ধমূর্তি ও মন্দির পাওয়া গেছে। চীন দেশে বৌদ্ধশিল্পের কেন্দ্রস্থল তিনটি—টুং হুয়াং ছাড়া অপর দুটি হল য়ুং কাং গুহা ও লং মেন গুহা। এসব জায়গায় স্তূপ ছিল না, ছিল মূর্তি। টুং হুয়াং-এর গুহার মুখে আছে একটা বিশাল বুদ্ধমূর্তি, ছত্রিশ মিটার উঁচু। আর একটা মূর্তির উচ্চতা তিরিশ ফুট। আর এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ২,৪০০টি বুদ্ধমূর্তি। মাটি দিয়ে তৈরি, তার ওপর রঙ করা।বড়ো মূর্তিদুটোর গায়ে একসময় সোনার পাত লাগানো ছিল, পোশাকে ছিল রঙিন নকশা, দেখে মনে হত সোনার তৈরি। ভারতীয় বিশেষ করে অজন্তার ছবির সঙ্গে টুং হুয়াং-এর কোন কোন গুহার ছবির সাদৃশ্য থাকলেও মাটির বুদ্ধমূর্তিতে বেশ নতুনত্ব চোখে পড়বে। য়ুং কাঙের চল্লিশটি গুহায় হাজার হাজার মূর্তি আছে। পঞ্চাশ ষাট ফুট উঁচু এক একটি বিরাট বুদ্ধমূর্তিকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার অন্যান্য মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। শোনা যায়, ৪৬০ সালে সম্রাট ওয়েঙ্-চেঙ্ পাঁচটি গুহামন্দির নির্মাণের আদেশ দিলেন। প্রত্যেক মন্দিরে বিশাল বুদ্ধ তৈরি হয়।এঁদের মুখেও চীনে ছাপ আছে।

ভারতের চেয়ে ভারতের বাইরেই বড়ো বড়ো বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়ে বেশি। বামিয়ান বা টুং হুয়াং-এর কথা বলেছি। সিংহলের একটি বিহারে আছে পনেরো ফুট উঁচু উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি। আর একটি মূর্তি ছেচল্লিশ ফুট লম্বা,তবে এটি শায়িত নির্বাণমূর্তি। পাহাড়ের গা কেটে মূর্তিটা তৈরি করা হয়। কোরিয়ার রাজধানী সৌলের জাদুঘরে দুশো বিরাশি সেন্টিমিটার উঁচু লোহার উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি রয়েছে। জাপানের কামাকুরায় রয়েছে এক বিশাল বুদ্ধ বা 'দাইবুৎসু'। নীল সমুদ্রের দিকে চেয়ে বসে আছেন বুদ্ধ। সাতশো দশ বছরের পুরনো ব্রোঞ্জের মূর্তিটি চুয়াল্লিশ ফুট উঁচু। আর ওজন কত জানো ? ২৭৪,৪২৮ পাউণ্ড। তাঁর এক একটা কান সাড়ে ছ ফুট লম্বা। এর ভেতরটা ফাঁপা। বাঁ দিকের একটা দরজা দিয়ে ঢুকে মূর্তির শরীরের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো যায়। এদের বিশাল আকার

দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। পেগুর অনন্ত শয্যায় শায়িত বুদ্ধমূর্তিটি ১৮১ ফুট লম্বা। এছাড়া পথের মাঝখানে আছে বুদ্ধ চতুষ্টয়, অনেকটা চতুর্মুখ ব্রহ্মার মতো, প্রতিটির উচ্চতা ৯০ ফুট। কুশীনগরে বুদ্ধদেবের নির্বাণ মূর্তিটাও বেশ বড়ো, লম্বা কুড়ি ফুট। মূর্তিটা তৈরি করেন মাসু নামে শিল্পী, আর তৈরি করিয়েছিলেন হরিবালা স্বামী। লাডাখের শ্যে প্যালেসেও আছে একটি বিশাল তামার বুদ্ধ, সোনার আস্তরণে মোড়া। বসা অবস্থাতেই মূর্তিটি দোতলার সমান উঁচু। আলচি গুম্ফায় রয়েছে কুড়ি ফুট উঁচু অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব। ভারতে খুব বেশি বড়ো বুদ্ধমূর্তি নেই। প্রথম দিকে কিছু তৈরি হলেও পরে আর চোখে পড়ে না। হয়তো যা ছিল সবই ভেঙে গেছে। বড়ো জিনিসই তো আগে ভাঙে, বড়ো গাছই আগে পড়ে।

বুদ্ধদেবের মূর্তি গড়া বা ছবি আঁকা কিন্তু শেষ হল না। বছরের পর বছর ধরে চলতে লাগল ভাঙা-গড়া। হাজার হাজার বুদ্ধমূর্তি তৈরি হতে লাগল ছোট, বড়ো, শোয়া, বসা, দাঁড়ানো—নানারকম ভঙ্গি, মুখে নানারকম অভিব্যক্তি। কোনওটাই যেন পছন্দ হয় না। শুধু মুখ বা ভঙ্গি নয়, বুদ্ধদেবের পোশাক সম্বন্ধেও নানা মুনির মত দেখা গেল। গান্ধার শিল্পীদের কেউ কেউ বুদ্ধদেবকে পরিয়েছিলেন কাপড় ও চাদর। চাদরটি বুকে জড়ানো। কুষাণ যুগের শিল্পীরা বললেন, না, বুকের একদিকটা খোলা থাকবে। আসল বুদ্ধদেব চীবর পরতেন, ভিক্ষেয় পাওয়া মোটা কাপড়। ভাস্করেরা তাঁকে পরালেন নাইলন বা মসলিনের মতো স্বচ্ছ পোশাক। টুং হুয়াং-এর শিল্পী বুদ্ধকে পরিয়েছেন তাঁদের দেশের পোশাক। এছাড়া কেউ কানে দুল পরালেন, কেউ কপালে টিপ। বুদ্ধদেবের চুল সম্বন্ধে শুধু জানা যায় গৃহত্যাগের পর তিনি চুল কেটে ফেলেছিলেন। মাথা ন্যাড়া করেননি তাই শিল্পীর কল্পনায় বুদ্ধদেবের চুল কোঁকড়া এবং মাঝখানে একটি চুড়ো করে খোঁপা বাঁধা আছে। বুদ্ধদেবের কি চুল ছিল ? ভিক্ষু বা সন্ন্যাসীদের কাউকেই চুল রাখতে দেখা যায়নি, বরং কেটে ফেলাই নিয়ম। তিব্বত ভুটান প্রভৃতি দেশে মেয়েরাও চুল ছোট করে ছাঁটে। তিব্বতী থংকাতেও ছবি আঁকা হয়েছে বুদ্ধদেব চুল কেটে ফেলছেন।

এরপরে এলো চোখের কথা। কেউ বললেন, বুদ্ধদেব ধ্যানে বসেছেন তাই চোখ বুজে আছেন। কেউ বললেন, তিনি উপদেশ দিচ্ছেন কিনা তাই তাকিয়ে আছেন। দুরকম মূর্তিই আছে। যাঁরা বুদ্ধমূর্তির চোখ নিয়ে এত চিন্তা-ভাবনা করলেন তাঁরা বললেন, বুদ্ধদেব তাকিয়ে থাকলেও কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। ভারতীয় দেবমূর্তির এই বৈশিষ্ট্য সব জায়গায় আছে। দেবতা তাকিয়ে আছেন কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষের দিকে নয়। গান্ধার শিল্পীদের বুদ্ধমূর্তি তাকিয়ে থাকেন

নিজের নাকের ডগাটির দিকে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কাটতে লাগলো বছরগুলো। পাথরের ছাড়াও কাঠের বুদ্ধমূর্তি তৈরি হয়েছিল বেশ কিছু। দেবতার দারু-মূর্তি শাস্ত্রসম্মত। পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তিও তো কাঠের। যদিও অনেকে বলেন পুরীতে আসলে বৌদ্ধদের স্তূপ ছিল, পরে ওখানে হিন্দুরা জগন্নাথদেবকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। পুরী যে বৌদ্ধ নগর ছিল তার আর একটা প্রমাণ হল পুরীতে কোন নিয়ম পালন করতে হয় না, সেখানে জাতপাতের বিচার নেই। বুদ্ধদেব জাতপাত মানতেন না আর হিন্দুদের কোন নিয়ম পালন করতেন না। পুরীতেও সে নিয়ম হল কি করে ? নিশ্চয় কোন কারণ আছে। তার সঙ্গে বুদ্ধমূর্তির কোন সম্বন্ধ অবশ্য নেই।

গুপ্ত যুগের সময়ই ভারতীয় ভাস্কর্যের সবচেয়ে উন্নতি হয়। বুদ্ধমূর্তির বৈশিষ্ট্যও বুঝিয়ে দেওয়া হল। ধ্যানী বুদ্ধের হাতের মুদ্রা তৈরি হল পাঁচ রকমের। বাহনও পাঁচটি আবার প্রতীকও পাঁচটি। শুধু তাই নয় এঁদের গায়ের রঙও আলাদা। বহু যুগের ওপার থেকে এখন আর রঙ চেনা যায় না, সবই একরঙা হয়ে গেছে। আসলে ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তিতে খুব যে পার্থক্য আছে তা নয়, পরিবর্তন হয়েছে তাঁদের হাতের মুদ্রা আর নামে। যেমন ধরা যাক প্রথম মূর্তিটির নাম অক্ষোভ্য। এঁর গায়ের রঙ নীল, মুদ্রা ভূমিস্পর্শ। বৌদ্ধরা একে বলেন সাক্ষীমুদ্রা, কারণ বোধিবৃক্ষের তলায় বসে বুদ্ধদেব যখন তপস্যা করছিলেন তখন মার এসে তাঁকে তুলে দেবার চেষ্টা করছিলেন। বুদ্ধদেব ওঠেননি, তিনি তাঁর সাক্ষী রাখলেন পৃথিবী বা ভূমি স্পর্শ করে। তাই এ মুদ্রাটিকেই অনেকে বলেন আসল মুদ্রা। আসল-নকল জানি না, বুদ্ধমূর্তির এই ভঙ্গিটিই পূর্ব এশিয়ায় সবচেয়ে জনপ্রিয়। অধিকাংশ মঠ বা বিহারে এ মূর্তিটি চোখে পড়ে। অক্ষোভ্য বুদ্ধের বাহন হচ্ছে দুটি হাতি এবং প্রতীক বজ্র। বুদ্ধদেবের কোন বাহনের কথা আমরা ইতিহাসে পাই না। তাই মনে হয় হাতি দুটোও ঐ মূর্তির প্রতীক চিহ্ন ছিল প্রথমে। কিংবা হিন্দু দেবতাদের সবারই বাহন আছে বলে বৌদ্ধরাও বুদ্ধদেবের বাহন কল্পনা করে নিয়েছেন। অপরদিকে হিন্দুরাও বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর দশাবতারের একজন বলে প্রচার শুরু করেছিলেন।

হিন্দুধর্মে বিষ্ণু বা নারায়ণের দশাবতারের কথা বলা হয়। নারায়ণ এক এক জন্মে এক এক রূপ ধরে এসে দুষ্টের দমন করে পৃথিবীকে রক্ষা করেছেন। এভাবে মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি অবতারের কথা বলা হয়। এর মধ্যে কল্কি এখনও জন্মাননি আর অন্যদের নিয়ে একেকটা গল্প থাকলেও বুদ্ধ সম্পর্কে হিন্দুরা আর বিশেষ কিছুই বলেননি। তাই আমরা ধরে নিতে পারি, বুদ্ধদেবের অতিরিক্ত জনপ্রিয়তা দেখে তাঁরা

বুদ্ধকেও নিজেদের দেবতারূপে গ্রহণ করতে দ্বিধা করেননি। তা না করলেও বৌদ্ধরা কিছুটা ভয় নিশ্চয় পেয়েছিলেন এবং নিজেদের ধর্মকেও খুব প্রাচীন বলে প্রমাণ করবার জন্যে উঠে-পড়ে লেগে গিয়ে বুদ্ধদেবকেও এক অলৌকিক পর্যায়ে তুলে দিয়েছিলেন। এর ফল শেষ পর্যন্ত ভালো হয়নি।

বুদ্ধদেবের দ্বিতীয় ধ্যানমূর্তির নাম অমিতাভ। এঁর গায়ের রঙ লাল আর হাতের মুদ্রা সমাধি অর্থাৎ পদ্মাসনে বসে কোলের ওপর দুটি হাত রাখা। অমিতাভর বাহন দুটি ময়ূর ও প্রতীক পদ্ম। তৃতীয় ধ্যানী বুদ্ধের নাম অমোঘসিদ্ধি। এঁর গায়ের রঙ সবুজ। হাতের মুদ্রাকে বলা হয় **অভয়মুদ্রা**। বসা বা দাঁড়ানো দুটি ভঙ্গিতেই দেখা যায় বুদ্ধদেব ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তুলে ধরে আছেন। এঁর বাহন হল গরুড় এবং প্রতীকচিহ্ন বিশ্ববজ্র। এর পরের ধ্যানীবুদ্ধ হচ্ছেন বৈরোচন, রঙ সাদা, হাতের মুদ্রার নাম বোধ্যঙ্গী বা ধর্মচক্র। হাত দুটি সুন্দর ভঙ্গিতে বুকের কাছে তোলা। ভঙ্গিটি হচ্ছে, ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তার পরের আঙুল তর্জনী দিয়ে বাঁ হাতের মধ্যমা বা তর্জনীকে স্পর্শ করা। এটি বুদ্ধদেবের ধর্মব্যাখ্যা করার ভঙ্গি। সারনাথে ধর্মচক্র মুদ্রায় বুদ্ধের একটি সুন্দর মূর্তি পাওয়া গেছে। গুপ্ত যুগের এই মূর্তির মুখে একসঙ্গে ক্ষমা ও করুণার যেভাবে সমন্বয় হয়েছে তার তুলনা হয় না। বৈরোচনের বাহন দুটি বিষধর সর্প ও প্রতীক চক্র। সবশেষের ধ্যানী বুদ্ধের নাম রত্নসম্ভব। গায়ের রঙ হলুদ। হাতে **বরদমুদ্রা**। এ মুদ্রা কতকটা অভয়মুদ্রার মতোই তবে হাতখানা সামনের দিকে ছড়ানো। বরদমুদ্রার মূর্তি বেশির ভাগই দাঁড়ানো। তবে তোমরা যে সব মূর্তি দেখতে পাবে তার অধিকাংশেরই হাত ভেঙে গেছে। এঁর বাহন দুটি সিংহ এবং প্রতীক রত্ন।

তোমরা মনে রেখো বুদ্ধদেবের মূর্তি বা ছবি বলতে আমরা যা বুঝি সেগুলি হল এই পাঁচটি মুদ্রার ধ্যানমূর্তির ছবি;হয়তো বা কিছু রকমফের আছে। এছাড়া আর একটি অর্থাৎ নির্বাণ মূর্তি বাদে সব মূর্তিই **বোধিসত্ত্বের**। সাধারণত গৌতম বুদ্ধের প্রথম জীবনের মূর্তিকে বলা হয় **বোধিসত্ত্ব**। পরে তাঁর পূর্ব জন্মের মূর্তিগুলিকেও বলা হল **বোধিসত্ত্ব**। ভবিষ্যৎ বুদ্ধও এখন রয়েছেন **বোধিসত্ত্ব** রূপে। বৌদ্ধধর্ম যখন লোপ পেতে বসেছিল তখন নাকি হাজার হাজার **বোধিসত্ত্ব** কল্পনা করা হয়। যে কোন মহৎ মানুষই **বোধিসত্ত্ব**। ভারতের বাইরে বজ্রযান সংঘে এখনও অনেক রকম **বোধিসত্ত্ব** মূর্তি আছে। তাদের একটা মোটামুটি হিসেব তোমাদের দিচ্ছি। সাধারণত **বোধিসত্ত্বের** সংখ্যা পঁচিশটি। এঁদের নাম **সমন্তভদ্র**, অক্ষয়মতি, ক্ষিতিগর্ভ, আকাশগর্ভ, গগনগঞ্জ, রত্নপাণি, সাগরমতি, বজ্রগর্ভ, অবলোকিতেশ্বর, মহাস্থামপ্রাপ্ত, চন্দ্রপ্রভ, জালিনীপ্রভ, অমিতপ্রভ,

প্রতিভানকূট, সর্বশোকতমোনির্ঘাতমতি সর্বনিবরণবিষ্কম্ভী, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, গন্ধহস্তি, জ্ঞানকেতু, ভদ্রপাল, সর্বাপায়ঞ্জহ, অমোঘদর্শী, সুরঙ্গম ও বজ্রপাণি।

ধ্যানী বুদ্ধমূর্তিকে কোন অলঙ্কার বা রাজপোশাক পরানো হয় না। বোধিসত্ত্বরা সবাই নানা রকমের সাজে অভ্যস্ত, অলঙ্কারও কম থাকে না। এঁদের কি করে চেনা যায় ? নাম না বলে দিলে তো হিন্দুদের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারেন। তাহলে ? যারই মূর্তি হোক না কেন সব বোধিসত্ত্বের মাথার কাছেই তাঁদের কুলপতি ধ্যানী বুদ্ধের একটি ছোট্ট মূর্তি বা চিহ্ন থাকে। তাতে বোঝা যায়। একটা উদাহরণ দিই। ধরা যাক অমোঘদর্শী বোধিসত্ত্বের মূর্তি দেখছি, তাঁর ডান হাতে পদ্ম বাঁ হাত কোমরের ওপর। এঁকে দেখে কি করে চিনব ? দেখা যাবে এঁর মাথার ওপরে অক্ষোভ্য ধ্যানী বুদ্ধের একটি ছোট্ট মূর্তি বা তাঁর প্রতীক চিহ্নটি রয়েছে। তখন বোঝা যায় ইনি আসলে একজন বোধিসত্ত্ব এবং এঁর কুলপতি হচ্ছেন অক্ষোভ্য বা সাক্ষীমুদ্রা।

বোধিসত্ত্বদের মধ্যে অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও মৈত্রেয়কে সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। তান্ত্রিক বজ্রযানসংঘে অবলোকিতেশ্বর সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। গৌতম বুদ্ধের নির্বাণের পর থেকে যতদিন না ভবিষ্যৎ বুদ্ধ মৈত্রেয় আসছেন ততদিন পর্যন্ত অবলোকিতেশ্বরই হর্তাকর্তা বিধাতা। তিনি ঠিক করেছেন যতদিন পৃথিবীতে একটি প্রাণীও দুঃখে থাকবে ততদিন তিনি মুক্তি বা নির্বাণ লাভ করবেন না। ত্যাগের আদর্শই তাঁর একমাত্র আদর্শ। অবলোকিতেশ্বরের ১০৮ রকম মূর্তি হয়। গায়ের রঙ সাদা, ডান হাতে বরদমুদ্রা, বাঁ হাতে ধরা থাকে পদ্ম। তাই এঁর অপর নাম পদ্মপাণি। পূর্ব এশিয়ায় অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ-রূপেই পুজো পান। মঞ্জুশ্রী সবচেয়ে বেশি পুজো পান নেপালে। চীন, জাপান, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত সর্বত্রই তাঁর মূর্তি পাওয়া যায়। এঁর ডান হাতে উদ্যত তরবারি, বাঁ হাতটি বুকের ওপর ধরে রাখা, তাতে একখানি বই, বইটি হচ্ছে প্রজ্ঞাপারমিতা। অসি বা তলোয়ার দিয়ে তিনি অবিদ্যা ও অজ্ঞানতাকে কেটে ফেলছেন। তাতে মনে হয় ইনি আসলে জ্ঞানের দেবতা। তেরো রকমের মূর্তি পাওয়া যায়। নেপালী প্রবাদে শোনা যায় মঞ্জুশ্রীই পাহাড় কেটে নেপালকে মানুষের বাসযোগ্য করে তুলেছেন।

মৈত্রেয় হচ্ছেন ভবিষ্যৎ বুদ্ধ। এখন তিনি 'তুষিত' নামক স্বর্গে বাস করছেন, সময় হলেই বুদ্ধরূপে জন্মগ্রহণ করবেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং নাকি একবার রাজগৃহে ভিক্ষুদের কাছে বলেছিলেন, 'ভবিষ্যতে মৈত্রেয় নামক এক ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর গায়ের রঙ সোনার মতো উজ্জ্বল। তিনি গৃহত্যাগ করে সর্ব জীবের মুক্তির জন্য ধর্মপ্রচার করবেন।' এই মৈত্রেয় হচ্ছেন সেই বোধিসত্ত্ব।

এঁর গায়ের রঙ সোনার মতো, এক হাতে বরদমুদ্রা, অন্য হাতে নাগকেশর গাছের ফুল-পাতা -সুদ্ধ একটি ডাল কিংবা একটা কমণ্ডলু। কোন কোন মৈত্রেয় বুদ্ধের চারটি হাত রয়েছে।

বলা বাহুল্য আমাদের ইতিহাসে পড়া গৌতম বুদ্ধের সঙ্গে এই বোধিসত্ত্বদের কোন যোগ নেই। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ ভক্তদের কাছে এঁরা সবাই গৌতম বুদ্ধেরই প্রতীক। অথচ বজ্রযান, কালচক্রযান প্রভৃতি তান্ত্রিক সংঘের বইপত্রে মানুষী বুদ্ধ হিসেবে গৌতম বুদ্ধ বেশি জায়গা পাননি। এঁদের মতে চব্বিশজন বুদ্ধের আবির্ভাব হয়েছিল,তার মধ্যে মানুষ ছিলেন শেষের সাতজন। গৌতম বুদ্ধ জন্মেছেন সবার শেষে। তাঁর আগের ছ জনের নাম বিপশ্যী, শিখী, বিশ্বভূ, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি ও কশ্যপ। শেষের দুজনও গৌতম বুদ্ধের মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তি,এমন একটা ধারণা চলে আসছে। হিন্দু পুরাণে কশ্যপ ঋষির নাম আছে। এঁর মূর্তিও একসময় তৈরি হত। হিউয়েন সাঙ যখন ভারতে এসেছিলেন তখন দেখেছিলেন অনেক বোধিসত্ত্ব মূর্তি, অন্যান্য বুদ্ধদের স্মৃতিচিহ্ন, 'ভুষিত' স্বর্গ থেকে বুদ্ধদেবের মর্ত্যে ফিরে আসার সিঁড়ি,আরো কত কী! তারপরে সে সবই লোপ পেয়ে গেছে। শুধু গৌতম বুদ্ধ স্থান করে নিয়েছেন আপামর মানুষের মনে। আড়াই হাজার বছর কেটে গেছে কিন্তু তাঁর আসনটি ঠিক আছে এখনও। সত্যি কথা বলতে কি অতিরিক্ত তন্ত্রমন্ত্রের কথা এবং দেব-দেবী বৌদ্ধধর্মে ঢুকে পড়াতেই বৌদ্ধধর্মের প্রভাব এদেশে কমতে থাকে। বুদ্ধদেব নিজে ছিলেন অত্যন্ত যুক্তিবাদী, তাঁর প্রকৃত ধর্মও ছিল অতি সহজ। সকলের মঙ্গল কামনাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। তাঁর ধর্মে প্রধান কথা ছিল শুধু তিনটি—এক, অশুভ আছে। এই অশুভই হচ্ছে দুঃখ। দুই, এই অশুভ বা দুঃখের কারণ হচ্ছে স্বার্থপরতা বা অপরের ওপর প্রাধান্য লাভের ইচ্ছা। তিন, নিঃস্বার্থপরতা দিয়েই এই দুঃখ বা অশুভকে জয় করা যায়। এত সহজ হলেও এই ধর্ম মন থেকে মেনে নেওয়া শক্ত। তাছাড়া অতি সহজ কথা বলে,অপরকে নিজের মতে নিয়ে আসাও শক্ত বলে নানারকম আনুষঙ্গিক জিনিস বৌদ্ধধর্মে ঢুকতে থাকে এবং শেষ দিকে দেখা যায় এসব তন্ত্রমন্ত্রে আসল বুদ্ধদেবের স্থান প্রায় নেই বললেই চলে।

এবার একটু বঙ্গদেশের কথা বলি। বঙ্গদেশ বলতে আমি পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ দুটোর কথাই বলছি। কারণ প্রাচীনকালে দুটো দেশ আলাদা ছিল না। এদেশে বৌদ্ধধর্মের খুব বেশি প্রচার হয়। বাংলার মাটি খুঁড়লেই পাওয়া যায় বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি। বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবিতা চর্যাপদও আসলে বৌদ্ধ কবিদের লেখা সাধন কবিতা। যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা ছিলেন সহজযানপন্থী

বৌদ্ধ। আমাদের কালীঘাটও নাকি আগে বৌদ্ধ স্তূপ ছিল, পরে কালীমন্দির হয়েছে। আগেই বলেছি বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যখন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে এল তখন হিন্দুরা বৌদ্ধ পীঠস্থানগুলিতে নিজেদের দেবতাকে প্রতিষ্ঠা করলেন। এটাই বোধহয় নিয়ম! মুসলমানেরাও অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ করেছেন। এখনকার বাংলাদেশে এককালে ছিল বৌদ্ধ পীঠস্থান। পাল রাজাদের সময়ে বাংলা ও বিহারে বজ্রযানপন্থীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় নানারকম মূর্তি তৈরি হয়েছিল। আসাম এবং উড়িষ্যাতেও কম ছিল না। বিহারের নালন্দায় মহাযানপন্থীরা এবং উড়িষ্যায় রত্নগিরিতে বজ্রযানপন্থীরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ ছাড়াও তৈরি হল লোকেশ্বর, উচ্ছুষ্মজম্ভল, মারীচী, বজ্রসত্ত্ব ও থেরুকের মূর্তি। এছাড়া অনেক দেবীমূর্তিও হল। বজ্রযানীরা বললেন এঁরা বুদ্ধের শক্তি। বৌদ্ধ দেবী তারা থেকেই নাকি হিন্দুদের মা কালী এসেছেন! পাহাড়পুরে একটা বিশাল স্তূপ তৈরি হয়েছিল জাভার বোরোবুদুরের মতো, আগেই বলেছি।

বাঙালীরা বুদ্ধদেবের সঙ্গে আরো দুটি দেবতাকে মিশিয়ে ফেললেন। এই দুটি দেবতা হলেন শিব ও ধর্মঠাকুর। দুজনের কেউই পৌরাণিক দেবতা নন, জাতপাতের বালাই মানেন না। শিবলিঙ্গর সঙ্গে বৌদ্ধ স্তূপের যেমন মিল ছিল তেমনি ধর্মঠাকুরের বাহন কচ্ছপের সঙ্গেও সাদৃশ্য আছে বৌদ্ধ স্তূপ আর পদচিহ্নের। কি করে যে কার সঙ্গে কতটা বুদ্ধদেব মিশে গিয়ে নতুনরূপে পুজো পেতে শুরু করলেন সে তর্ক করে লাভ নেই। শুধু এটুকু জানলেই হবে আমাদের আচার-বিচার-পুজো পদ্ধতি সব কিছুর সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতি এমনভাবে জড়িয়ে গেল যে তাকে আলাদা করে আর চেনার উপায় রইল না।

বুদ্ধদেবের আর একটি মূর্তি তৈরি হয়েছিল সেটি হল নির্বাণমূর্তি। সিংহশয্যায় শুয়ে আছেন বুদ্ধ, মাথার কাছে ভিক্ষু আনন্দ। এ মূর্তি কম দেখা গেলেও খুব সুন্দর। কুশীনগর ও অজন্তায় এই মূর্তি আছে। আছে সিংহলের গলবিহারে। তিব্বতী থংকায় আঁকা হয়েছে নির্বাণের ছবি। বুদ্ধের এই মূর্তির সঙ্গে অনন্ত শয্যায় শায়িত বিষ্ণুর বেশ সাদৃশ্য চোখে পড়ে। তবে এবার আর কোন শিল্পী আশি বছরের জরাজীর্ণ বুদ্ধ তৈরি করেননি। ভারতের নিয়মমতোই তৈরি করা হয়েছে নির্বাণমূর্তি। শেষ শয্যায় শুয়ে আছেন বুদ্ধদেব, মুখে সেই দেবোপম তরুণ লাবণ্য, তাতে কোন বিকার নেই। যেন ঘুমিয়ে আছেন ধ্যানী বুদ্ধ। ভারতের নিয়মমতো শাস্ত্র মেনে মূর্তি তৈরি করা হল। সবারই চেষ্টা, বুদ্ধদেবের শান্ত, ক্ষমাসুন্দর মুখখানি একটু একটু করে রূপ দিতে। সব কিছুর মধ্যে সেই হল আসল চেষ্টা। বাস্তবে তিনি কেমন দেখতে ছিলেন সে কথা

ভেবে নয়, শিল্পশাস্ত্রের নিয়ম মেনেও নয়,আসলে যুগ যুগ ধরে কল্পনায় পুঞ্জীভূত শ্রদ্ধা দিয়ে আমরা বুদ্ধদেবকে যেমনটি ভেবে এসেছি ঠিক সেই রূপটি। এভাবেই একদিন পাওয়া গেল তাঁকে, তাঁর আসল রূপটিকে। সত্যি সত্যি তিনি কেমন দেখতে ছিলেন তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করবার দরকার হল না। মানুষের শরীরের বিকৃতি আছে, আছে রোগ, শোক, জরা, মৃত্যু। বুদ্ধদেবের মৃত্যুঞ্জয়ী ক্ষমাসুন্দর মূর্তিকে তারা স্পর্শ করতে পারলো না। তিনি যে অনেক ঊর্ধ্বে। আড়াই হাজার বছর ধরে তাঁর ক্ষমার আদর্শ,ত্যাগের আদর্শ, অহিংসার আদর্শ নিয়ে তিনি বেঁচে আছেন আমাদের মনে, তার কি কোন পরিবর্তন হতে পারে ? পাঁচশো খ্রীস্টাব্দের মানুষ তাঁকে যেভাবে কল্পনা করে নিলেন, পনেরোশো বছর পরে আমরাও তাঁকে ঠিক সেভাবেই দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা তাঁর মূর্তি দেখলেই চিনতে পারি। তোমরাও পারো।

পৃথিবীতে আর কোন দেবতা বা মহামানবের এত রকম মূর্তি-কল্পনা করা হয়নি। এত মূর্তি গড়া হয়েছে বলেও শুনিনি। হাজার হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করা হয়েছে। অসংখ্য রূপ-কল্পনা করা হয়েছে। এখনও যে তাঁর রূপ-কল্পনা কি মূর্তি গড়া শেষ হয়েছে তা নয়। নিত্য-নতুন শিল্পীরা নতুন ছবি আঁকছেন, নতুন মূর্তি তৈরি করছেন। হাজার হাজার বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হয়েছে—কোনটা ভারতীয় রীতি মেনে ; আবার কোনটির মুখে অভারতীয় ছাপ। তাতে কিন্তু আমাদের কোন অসুবিধে হয় না,কারণ সবার মুখেই আমরা দেখতে পাই সেই স্বর্গের আভা ছড়ানো আছে। চোখের দৃষ্টি,ধ্যানমগ্ন মুখে মধুর হাসির আভাস, সব মিলে আশ্চর্য-সুন্দর অথচ করুণায় বিগলিত মুখ—কোনও মতেই আর ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। শত পরিবর্তনেও চেনা মুখটি হারায় না কিছুতেই। মাথায় জটা বাঁধলেও না, মুকুট পরলেও না। আমাদের অন্তরে ও রূপ গাঁথা হয়ে গেছে। কিন্তু সময়ের দিক থেকে যে মূর্তিটিকে বুদ্ধদেব বলে এক নিমেষে চিনিয়ে দিতে পারি, তাঁকে পাওয়া গেল খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে,অনেক ভাঙা-গড়ার পরে অর্থাৎ বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ লাভের প্রায় এক হাজার বছর পরে।

ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে বুদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্ন বা স্মারক। কয়েকটার নাম তোমরা জানো, কয়েকটা দেখেও এসেছো। কিন্তু সব জায়গায় আমাদের কারোরই যাওয়া হয়ে ওঠে না, দেখাও হয় না। আড়াই হাজার বছর ধরে কত স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য, গুহাচিত্র, মূর্তি তৈরি হয়েছে তার হিসেবও আমাদের জানা নেই। যে কটা আছে তার চেয়েএকশো গুণ অন্তত নষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সময় একটার ধ্বংসস্তূপের উপর উঠেছে আর একটা। এখন প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে পাচ্ছেন সে সব ধ্বংসাবশেষ। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণ পড়ে মনে হয় সে সময় মঠ, মন্দির ও স্তূপে সারা দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। সেই সঙ্গে ছিলেন অসংখ্য বৌদ্ধ ভিক্ষু। তবে ফাহিয়েন যেমন জমজমাট অবস্থা দেখেছিলেন হিউয়েন সাঙ তা দেখেননি। তখনই অনেক বিহার পরিত্যক্ত হয়েছে. স্তূপ ভেঙে গেছে, শূন্য মন্দিরে বুদ্ধদেবের মূর্তি পড়ে থেকেছে। তারপর কেটে গেছে আরো পনেরোশো বছর। অনেক পরিবর্তন হয়েছে। বিদেশীদের আক্রমণ ছাড়াও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উত্থানে বৌদ্ধ মন্দিরে হিন্দু দেবতা বসেছেন, স্তূপের ওপর মন্দির তৈরি হয়েছে, মসজিদ তৈরি হয়েছে। লোকে নিজেদের ঘর-বাড়ি তৈরি করবার জন্যে যখন খুশি ইট খুলে নিয়ে চলে গেছে। স্তূপের ইট দিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে, বাজারতৈরি হয়েছে। তবু যা আছে সংক্ষেপে সে কথা বলি। যদি তোমাদের আগ্রহ জাগে বড় হয়ে হয়তো নিজেরাই খুঁজে খুঁজে চলে যাবে সে সব জায়গায়। আর হঠাৎ যদি বেড়ানো হয়ে যায় তাহলে সেখানে গিয়ে নিজেরাই খুঁজে নিতে পারবে জায়গাগুলো। বৌদ্ধদের সবচেয়ে পবিত্র তীর্থ হচ্ছে আটটি—লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, শ্রাবস্তী, সঙ্কাস্য. রাজগৃহ ও বৈশালী। শেষের চারটি জায়গায় বুদ্ধদেব অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। সবচেয়ে পুরনো বৌদ্ধ স্মৃতি বা স্মারক যা পাওয়া গেছে তৈরি করিয়েছিলেন সম্রাট অশোক। প্রধানত তৈরি হয়েছিল স্তম্ভ. স্তূপ, গুহামন্দির, চৈত্য প্রভৃতি। সম্রাট অশোক তৈরি করিয়েছিলেন অন্তত তিরিশটি অশোক স্তম্ভ, যা ছড়িয়ে ছিল চম্পারণ, মুজঃফরপুর, সারনাথ, কৌশাম্বী, মীরাট, সাঁচী প্রভৃতি জায়গায়। এছাড়া ছিল অনেক শিলালিপি, ভগবান বুদ্ধের পালি ভাষায় ধর্মানুশাসন।

লুম্বিনী—প্রথমেই আসে লুম্বিনী উদ্যানের কথা। কিন্তু এই উদ্যানটি ভারতে নয়, নেপালের তরাই অঞ্চলে রয়েছে। সেই সঙ্গে সম্রাট অশোকের শিলালিপি

ঘোষণা করছে ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থানটির কথা। আমাদের পক্ষে লুম্বিনী দেখা শক্ত নয়। কুশীনগর থেকে কাছেই। ঐদিকে গেলে ইচ্ছে করলেই যাওয়া যায়, কারণ নেপালে যেতে ভারতীয়দের অনুমতিপত্র লাগে না।

বুদ্ধগয়া—বিহারের বেশ নামকরা জায়গা। গয়া হিন্দুদের প্রাচীন তীর্থস্থান। বুদ্ধগয়া তার কাছেই মাত্র ৬ মাইল দূরে। এখানেই গৌতম বুদ্ধত্ব অর্জনের জন্যে তপস্যায় বসেছিলেন। সেখানে তৈরি হয়েছে বিশাল মহাবোধি মন্দির। ১৮০ ফুট উঁচু। নিচে বিশাল বুদ্ধমূর্তি, ওপরে মায়া দেবী। খুব পুরনো মন্দির, ৭ম শতাব্দীর। ১১০৫ সালে বর্মার বৌদ্ধ ভক্তেরা মন্দিরটিকে সারিয়ে দেন ও বুদ্ধমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন।

এছাড়া আছে বোধিবৃক্ষ, যদিও আসলটি নয়, তবে এ গাছও পুরনো। হিউয়েন সাঙ এখানে অনেক স্তূপ দেখেছিলেন, এখন একটাও চোখে পড়ে না। অনেকে মনে করেন, বিষ্ণুপাদপদ্মটি আসলে ছিল বুদ্ধদেবের পদচিহ্ন। হিন্দুরা সেটি আত্মসাৎ করেছেন। এছাড়া বুদ্ধগয়ায় আছে অনিমেষলোচন চৈত্য ও বিভিন্ন জাপানী মন্দির।

সারনাথ— উত্তরপ্রদেশে বারাণসী শহরের পাশেই রয়েছে সারনাথ বা ইসিপত্তন। এখানে বুদ্ধদেব প্রথম ধর্মপ্রচার করলেন। অনেক কিছু দেখবার আছে এখানে। মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। নতুন মন্দিরগুলোতে বেশি সময় নষ্ট না করে এইখানে একটু ভাল করে দেখো। বিহার, ভিক্ষুদের বাসস্থান, স্তূপ, মূলগন্ধকুটি সবই ভেঙে গেলেও খুঁজে পাওয়া গেছে। অনেক সুন্দর মূর্তি রাখা হয়েছে জাদুঘরে। আমার মনে হয় তোমাদের সবচেয়ে ভালো লাগবে ৪৬ মিটার উঁচু ধামেক স্তূপ। অর্ধেকটা ভেঙে গেলও অটুট আছে মূল কাঠামোটি। নিচের দিকে পাথর, ওপরে ইট গাঁথা। স্তূপের গায়ে কুলুঙ্গী, সেখানে রাখা হত বুদ্ধমূর্তি। এছাড়া সে যুগের সূক্ষ্ম কাজের নিদর্শন আছে সেখানে—কোনটা পদ্মলতা, কোনটা ত্রিকোণ, আবার কোনটা চাটাইয়ের মতো। এর কাছেই ছিল ধর্মরাজিকা স্তূপ ও ভিক্ষু বলের উপহার দেওয়া বুদ্ধমূর্তি। অল্প দূরে চৌখণ্ডী স্তূপ। এখানেই বুদ্ধদেবের পঞ্চ শিষ্য থাকতেন।

কুশীনগর— উত্তরপ্রদেশের বর্তমান কাশিয়াই হল কুশীনগর। কাছেই বড় শহর গোরক্ষপুর নাথযোগীদের তীর্থস্থান। কুশীনগরের স্তূপ মন্দির সবই ধ্বংস

হয়ে গেছে। নির্বাণ স্তূপটি দেখতেই লোকে সেখানে যায়। স্তূপটি উঁচু ৪৬ মিটার, ইটের গাঁথনি। গুপ্তযুগের তৈরি। বোধহয় তার আগের স্তূপ ভেঙে গিয়েছিল। এছাড়া পাওয়া গেছে নির্বাণের মূর্তি বা শায়িত বুদ্ধ। আরও আছে অনেক নতুন মন্দির। খোঁড়াখুড়ির কাজ এখনও শেষ হয়নি।

শ্রাবস্তী—বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের দুটি গ্রাম সাহেত ও মাহেত। এখানেই ছিল অনাথপিণ্ডদকের জেতবন আরাম। এখন তার কিছুই নেই। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের ফলে পাওয়া গেছে জেতবনের ঘরবাড়ির সম্পূর্ণ নকশা এবং মূলগন্ধকুটির ভিত্তি। বাড়ি-ঘর-স্তূপ যা পাওয়া গেছে তার কোনটাই মৌর্য যুগের আগের নয়। বালিপাথরের একটি পাত্রে পাওয়া গেছে পবিত্র অস্থি, একটা সোনার পাতা ও রৌপ্য মুদ্রা। বুদ্ধদেবের একটা বিশাল মূর্তি ছিল এখানে, প্রসেনজিতের তৈরি করা। ফাহিয়েন ও হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন সেই মূর্তি।

সঙ্কাস্য—উত্তরপ্রদেশের সঙ্কাস্য কি করে বৌদ্ধ তীর্থ হয়ে উঠল কে জানে। প্রবাদ, বুদ্ধদেব তাঁর মা ও স্বর্গের দেবতাদের কাছে ধর্ম প্রচার করে এখানেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য এর সঙ্গে গৌতম বুদ্ধের যোগ খুঁজে পাওয়া কঠিন। কিন্তু মহাযানপন্থীদের কাছে সঙ্কাস্য খুব বড় তীর্থ। ঢিবির মতো কিছু জায়গা ও দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া আর কিছুই নেই। আগে নাকি ছিল স্বর্গে যাবার সিঁড়ি। দু-চারটে ধাপ চীনা পরিব্রাজকরা দেখেছিলেন। ভক্ত রাজারা আবার সে সিঁড়ি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

বৈশালী—বিহারের মুজঃফরপুর জেলার বসাড় গ্রামে পাওয়া গেছে বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ। এখানে বুদ্ধদেবকে বানরেরা মধু উপহার দিয়েছিল। মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করে এখানে পাওয়া গেছে স্তূপের ধ্বংসাবশেষ; বুদ্ধদেবের অস্থি ছিল এই স্তূপে। সম্রাট অশোক সেটি বার করে ভাগ করে দেন ও প্রতিটির ওপরে একটি করে স্তূপ নির্মাণ করা হয়। কাছেই পাওয়া গেছে লাল বেলেপাথরে তৈরি ১৮ মিটার উঁচু অশোক স্তম্ভ। তেরোটা স্তূপের মাত্র ছটার অস্তিত্ব বা ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে স্তূপের মধ্যে বাক্সে বা পাত্রে করে দেহাবশেষ রাখা হত কি করে আর প্রত্নতাত্ত্বিকরাই বা সেটা খুঁজে বার করে ফেলেন কি করে, তাঁরা তো স্তূপটা ভেঙে উড়িয়ে দেন না। আসলে কৌটোটা থাকে স্তূপের মাঝখানে এবং মাথায় থাকে একটা চৌকো পাথর, সেই জায়গাটা খুলে নিচে নেমে জিনিসপত্র তুলে আনা যায়। তা বলে স্তূপটা সম্পূর্ণ ফাঁকা হত

না, ইট দিয়ে গাঁথা হত। দক্ষিণ ভারতে দেখা গেছে একটা স্তূপের ভিত্তিতে ছিল একটা বিরাট গোরুর গাড়ির চাকার মতো ছক। এই ধর্মচক্রের ওপরে গড়ে উঠেছিল গোল স্তূপ।

রাজগৃহ—বিহারের রাজগৃহ বা রাজগির প্রাচীনকালে ছিল মগধের রাজধানী। পুরাকালে জরাসন্ধ থাকতেন এখানে। বুদ্ধদেব এখানে কয়েকবার এসেছেন। জৈনদেরও এটি তীর্থ। হিন্দুরা উষ্ণ জলের ঝরনায় স্নান করতে যায়। আমরা সাধারণত এখানে গিয়ে গরম জলের ঝরনা দেখে ও খাজা কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরি কিংবা নালন্দা দেখতে চলে যাই। কিন্তু রাজগিরের মাটির নিচে পাওয়া গেছে বহু স্তূপ ও মন্দিরের হদিস। অজাতশত্রু বুদ্ধের পদনখকণা নিয়ে তৈরি করেছিলেন স্তূপ। তাঁর বাবা বিম্বিসারের জেলও আছে। এখানেই বন্দী থাকতেন তিনি। কারাগারে বসে তিনি চেয়ে থাকতেন গৃধ্রকূট পাহাড়ের ওপরের ছোট্ট বেদীটির দিকে, যার ওপর বসে থাকতেন বুদ্ধদেব। গৃধ্রকূট পাহাড় আজও দুর্গম এবং বিপদসঙ্কুল। তবু কেউ যদি সেখানে যায় দেখতে পাবে দুটি গুহা ও একটি বেদী বা চত্বর। এছাড়া আছে বিম্বিসারের প্রথম উপহার বেণুবন ও রাজবৈদ্য জীবকের আমবাগান। বিশ্বশান্তি স্তূপে যেতে হয় রোপওয়ে চেপে। আর কাছেই রয়েছে জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্মস্থান পাওয়াপুরী।

নালন্দা—রাজগির থেকে দশ কিলোমিটার উত্তরে নালন্দা। অত্যন্ত পুরনো জায়গা। অতীতের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিং এখানে পড়তে এসেছিলেন। ধর্মকে কেন্দ্র করে এত বড়ো শিক্ষাকেন্দ্র আর কোন দেশে গড়ে ওঠেনি। এখানকার মাটিতে এখনও পর্যন্ত সাতটি স্তর পাওয়া গেছে, আরো হয়তো পাওয়া যাবে। কারণ শোনা যায় সম্রাট অশোক এখানে সারিপুত্তের চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত শুধু গুপ্ত যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। হর্ষবর্ধনের আমলে নালন্দা মহাযানী বৌদ্ধদের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। অনেক মূর্তিও পাওয়া গেছে, সবই আছে এখানকার সংগ্রহশালায়। তোমরা মন দিয়ে এই বিশাল ধ্বংসাবশেষটি দেখো। আটটি মহাকক্ষ ও তিনশটি ঘরের সন্ধান পাওয়া গেছে। অনেকটা সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখা ভালো। মন্দিরটি ছাড়াও দেখো ছাত্রদের থাকবার ঘরগুলো। প্রত্যেক ঘরে থাকতেন দুটি ছাত্র। একপাশে তাঁদের খাট ও টেবিল, দুটোই পাথরের অবশ্য। একটি বড় ও একটি ছোট। একজন উঁচু ক্লাসের ছাত্র ও অপরজন নিচের ক্লাসের। বড় ছাত্রকে ছোট ভাইয়ের মতো

ছাত্রটির পড়া দেখিয়ে দিতে হত। সবাইকে থাকতে হত কড়া শাসনের মধ্যে। বৌদ্ধদের মধ্যে পড়াশোনার আগ্রহটা খুব বেশি। তাঁদের সব বিহারেই অল্পবিস্তর পড়ানো হত।

পিপারওয়া— উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার পিপারওয়া এমনিতে খুব সামান্য জায়গা হলেও এখানেই পাওয়া গিয়েছে সম্রাট অশোকেরও আগেকার একটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। এখানকার ইটগুলো বড় বড়। ৩৫ মিটার ব্যাস হলেও উচ্চতা বেশি নয়, ৬ মিটারের একটু বেশি। এই স্তূপের মধ্যে যে পাত্রটি পাওয়া গেছে তার মধ্যে আছে বুদ্ধদেবের অস্থি, যা অন্যত্র পাওয়া যায় না। এই মহামূল্যবান পাত্রটি এখন রাখা আছে কলকাতার জাদুঘরে।

লৌরিয়া-নন্দনগড়—বিহারের চম্পারণ জেলার দুটি ছোট্ট জায়গা, কিন্তু এখানেই পাওয়া গেছে সম্রাট অশোকের বিজয়স্তম্ভ। এছাড়া পনেরোটা স্তূপের ধ্বংসাবশেষ। নন্দনগড়ে যে স্তূপটি পাওয়া গেছে সেটাও দু হাজার বছরের পুরনো গঠনরীতি, বাংলাদেশের পাহাড়পুর ও জাভার বোরোবুদুর স্তূপের মতো। সে দুটির নির্মাণকালও একই সময়ের।

কৌশাম্বী—আধুনিক কোশামই হচ্ছে পুরনো দিনের কৌশাম্বী। এখানেই ছিল বিখ্যাত 'ঘোষিতারাম' বিহার। বুদ্ধদেব এখানে দুটি বর্ষা কাটিয়েছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের পরে জানা গেছে হূনেদের আক্রমণে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল শহরটি। ধ্বংসাবশেষ থেকে মূর্তি, মুদ্রা, হাতির দাঁতের জিনিস প্রভৃতি পাওয়া গেছে। ধ্বংসাবশেষটিই এখানে দর্শনীয়।

সাঁচী—প্রাচীন যুগের যে কটি স্থাপত্য-শিল্প রক্ষা পেয়েছিল, সাঁচী তাদের অন্যতম। সাঁচীতে বুদ্ধদেব কোনদিন আসেননি। কিন্তু সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নেন সাঁচীতেই। এখানে তিনি আটটি স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। যার তিনটি আজও রয়েছে সাঁচীতে। তবে যে স্তূপটি যুগ যুগ ধরে দর্শকদের সাঁচীতে টেনে নিয়ে আসছে, সেটি তৈরি হতে অনেকদিন সময় লেগেছে। ৪২ ফুট উঁচু স্তূপটির ব্যাস ১০৬ ফুট। স্তূপের কোথাও কোন বুদ্ধমূর্তি নেই, আছে তাঁর প্রতীক চিহ্ন—পদ্ম, বোধিদ্রুম, চক্র ও পদচিহ্ন। স্তূপের চারটি প্রবেশদ্বারে অজস্র কারুকাজ। তোমরা সাঁচীতে গেলে অনেক সময় নিয়ে এই তোরণগুলো দেখো, কারণ এখানেই দেখতে পাবে মানুষী বুদ্ধদের সাতজন্মের কাহিনী, জাতকের গল্প,

বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধের নির্বাণ, ধর্মোপদেশ দানের প্রতীক। শুধু কি তাই ? একটি তোরণের সূক্ষ্ম কাজ দেখে মনে হবে ভারতের যত গয়নার নকশা বুঝি এখানে রয়েছে। এই তোরণটি করিয়ে দিয়েছিলেন সে যুগের মণিকার শিল্পীরা। এই স্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে সারিপুত্তের অস্থি। কাছেই আছে নিউবিহার স্তূপ, ভগ্ন অশোক স্তম্ভ, চৈত্য, উপাসনাগৃহ, বিশাল ভিক্ষাপাত্র এবং একটি সুন্দর সংগ্রহালয়।

বৈরাট—রাজস্থানে জয়পুরের খুব কাছে রয়েছে বৈরাট। অথচ আমরা জয়পুর বেড়িয়ে ফিরে আসি। তবে ক্রমশই বৈরাটের দর্শক বাড়ছে। এখানে সম্রাট অশোকের শিলালিপি ছাড়াও পাওয়া গেছে বৌদ্ধ মন্দিরের ভগ্নস্তূপ, পোড়ামাটির যক্ষীমূর্তি, মৃৎপাত্র, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের নিত্য-ব্যবহার্য নানারকম জিনিসপত্র। এই বৈরাটই মহাভারতের যুগে ছিল বিরাট রাজ্য। পাণ্ডবেরা এখানে এক বছর অজ্ঞাতবাস করেছিলেন। কীচক বধ কোথায় হয়েছিল তা অবশ্য কেউ বলতে পারবে না।

দেবনিমোরি—গুজরাটের দেবনিমোরিতে একটি বিশাল বৌদ্ধ স্তূপের সন্ধান পাওয়া গেছে। স্তূপটি তৈরি হয়েছিল ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দে। এই স্তূপের সঙ্গে মীরপুর খাসের স্তূপের সাদৃশ্য চোখে পড়ে। এর বারোটা স্তম্ভে করিনথিয়ান স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গুজরাটে,বিশেষ করে আমেদাবাদে গেলে এই জায়গাটি সকলেরই দেখে আসা উচিত।

রত্নগিরি—উড়িষ্যার কটক জেলায় রত্নগিরি পাহাড়। যাওয়া-আসা একটু কষ্টকর। একসময় রত্নগিরি মহাযান,বিশেষ করে বজ্রযান সংঘের বড় কেন্দ্র ছিল। নালন্দার মতো এখানেও শিক্ষা দেওয়া হত। বজ্রযানী শিল্পকলার অনেক নিদর্শন এখানে ছড়িয়ে রয়েছে। প্রধান স্তূপটি ইটের। তাছাড়া রয়েছে দুটো ভাঙা মন্দির ও অজস্র বুদ্ধমূর্তি। সেই বিরাট ভগ্নস্তূপের ছন্নছাড়া মূর্তি দেখে বোঝা যায় একদিন এখানে অনেক ছাত্র আসত এবং লেখাপড়া শিখত।

অমরাবতী—অন্ধ্রপ্রদেশে একসময়ে গড়ে উঠেছিল অমরাবতী স্তূপ। সাঁচীর স্তূপের চেয়েও বড় এবং কারুকার্যখচিত। এখানেও অনেক জায়গায় বুদ্ধের উপস্থিতি বোঝানো হয়েছে আসন দিয়ে। একটা সুন্দর দেওয়াল চিত্র আছে রাহুল তার বাবার কাছে পৈতৃক ধন চাইছে ; আসনটি শূন্য, ধরে নিতে হবে বুদ্ধদেব

ওইখানে বসে আছেন। সাতবাহন রাজাদের রাজধানীর পাশেই গড়ে উঠেছিল এই বিশাল বৌদ্ধবিহারটি,কিন্তু এই স্তূপটি প্রায় সবই ভেঙে গেছে। এর অনুপম ভাস্কর্যগুলি রাখা আছে বিভিন্ন সংগ্রহালয়ে।

নাগার্জুনকোণ্ডা—মাটির নিচে দুই হাজার বছরেরও পুরনো বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে নাগার্জুনকোণ্ডায়। এই স্তূপটি সম্রাট অশোকের সময়ের হওয়া অসম্ভব নয়। এখানে অনেকগুলি স্তূপের ও চৈত্যের ভগ্নাবশেষ আছে। এখানে শুধু বিহার নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ও ছিল এবং বৌদ্ধপণ্ডিত আচার্য নাগার্জুন বাস করতেন এখানে। তাঁর নামেই এ-জায়গার নাম হয়েছে। তোমরা যদি যাও বেশ অনেকটা সময় নিয়ে এ-জায়গাটাও দেখো। বিশেষ করে সেই চাকার মতো মঠটা। এখন অবশ্য মঠ বা মন্দির নেই,আছে শুধু তার গঠনশৈলীটুকু। তাতে মনে হবে একটি বিশাল চাকা পড়ে আছে বুঝি। এ চাকা ধর্মচক্রের প্রতীক। এখানকার সংগ্রহশালাও খুব সমৃদ্ধ। বুদ্ধমূর্তিও রয়েছে।

নাগাপত্তিনাম—তামিলনাড়ুর তাঞ্জাভুরের কাছে নাগাপত্তিনাম একটি বৌদ্ধ তীর্থ। এখানকার চূড়ামণিবর্মা বিহারে চোল রাজারা বহু আক্রমণ চালিয়েছেন। তবু খানিকটা ছিল;১৮শ শতকের জেসুইট পাদ্রীরা এসে সেটাও ভেঙে ফেলেন। এই বিহারের সঙ্গে পূর্ব এশিয়ার প্যাগোডার কিছু সাদৃশ্য ছিল। আজ নাগাপত্তিনাম শুধুমাত্র স্মৃতিতে পর্যবসিত হয়েছে।

বিজয়ওয়াদা— অন্ধ্রপ্রদেশে বিজয়ওয়াদার কাছে দর্শনীয় মন্দির রয়েছে কয়েকটা। কাছেই আছে বিদ্যাধরপুরম ধ্বংসস্তূপ। এখানকার ভিক্টোরিয়া মিউজিয়ামে কালো গ্রানাইট পাথরের বুদ্ধমূর্তিটিও নিশ্চয় দেখে নিও।

ভাট্টিপ্রোলু গুডিভাদা—দুটি বিশাল স্তূপ এখানে রয়েছে। খুব যে উল্লেখযোগ্য তা নয়। প্রথম স্তূপটির ব্যাস ৪০ মিটার,দ্বিতীয়টির ৩৯ মিটার। এই সঙ্গে আরো কয়েকটা স্তূপের কথা সেরে নিই। এগুলোছোট মাপের স্তূপ। গরিকাপড়ু স্তূপের ব্যাস ২৫ মিটার। জগ্গায়াপেতা স্তূপের ব্যাস ১৯ মিটার। গন্থশালা স্তূপের ব্যাস ৩৭ মিটার আরপেড্ডা গঞ্জামের স্তূপের ব্যাস ১২ মিটার। এগুলো সবই ইটের তৈরি স্তূপ, কারুকার্যহীন এবং ভেতরেও কোন ঘর নেই। রামতীর্থমে একটি স্তূপ আছে সেটি পাথরের তৈরি।

অজন্তা—তোমরা নিশ্চয় ভাবছো এতক্ষণ অজন্তার নাম করিনি কেন ? কারণ অজন্তায় আছে অন্য ধরনের শিল্প। এখানে রয়েছে গুহাচিত্র। অবশ্য স্থাপত্যও রয়েছে। অজন্তা রয়েছে মহারাষ্ট্রে। পৃথিবীর দূর-দূরান্ত থেকে পর্যটকরা আসেন অজন্তা দেখতে। প্রায় ৯০০ বছর ধরে অজন্তার পাহাড় কেটে গুহা তৈরি ও ছবি আঁকা হয়েছিল। ৩০টি গুহার মধ্যে এখন মাত্র ১০টির ছবি দেখা যায়। সবই খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অদূর ভবিষ্যতে আরো নষ্ট হয়ে যাবে। এখানে বুদ্ধদেবের জীবনের বহু ঘটনার ছবি তো আছেই, সেইসঙ্গে রয়েছে সমকালীন সমাজের ছবি, সাজপোশাক ইত্যাদি। এখানেই তোমরা দেখতে পাবে বোধিসত্ত্বের সবচেয়ে সুন্দর ছবি। হাতে ফুল কিন্তু ফুলের ওপর থেকে তাঁর দৃষ্টি চলে গেছে অনেক দূরে। এখানে দেখতে পাবে চারটে হরিণের একটা মাথা, দেখতে পাবে রানীর হারের মুক্তোয় আলো ঝিকমিক করে উঠছে থেকে থেকে।

ইলোরা—অজন্তার সঙ্গেই ইলোরার নাম করি আমরা। ছেলেবেলায় অনেকদিন পর্যন্ত ভাবতুম অজন্তা ও ইলোরা দুটি পাশাপাশি গুহা বুঝি। ঔরঙ্গাবাদের খুব কাছেই রয়েছে ইলোরা গুহা, সবসুদ্ধ ৩৪টা। এ গুহাগুলোও পাথর কেটে তৈরি করা কৃত্রিম গুহা। প্রত্নতত্ত্ববিদরা বলেন, দু লক্ষ টন পাথর কেটে বার করা হয়েছিল পাহাড় থেকে। অজন্তার মতো ছবি না থাকলেও ভাস্কর্য অতুলনীয়। দক্ষিণমুখী বারোটা গুহা বৌদ্ধদের, সতেরোটা হিন্দুদের ও উত্তরমুখী পাঁচটা জৈনদের। পাঁচ ও দশ নং গুহা দুটো খুব বড় এবং বৌদ্ধদের তৈরি করা। দশ নম্বরে আছে বিরাট একটা বুদ্ধমূর্তি। সময়ের অভাবে অনেকেই সব গুহা দেখে না, কয়েকটা দেখে চলে আসে। তোমরা যদি যাও, সব দেখো আর ভেবো সেই শিল্পীদের কথা, যাঁরা এসব তৈরি করেছিলেন নিজের হাতে।

নাসিক—প্রসিদ্ধ হিন্দু তীর্থ। প্রতি বারো বছরে কুম্ভমেলা হয় এখানে। বনবাসের সময় রাম কিছুদিন ছিলেন, শূর্পনখা এসে লক্ষ্মণকে বিয়ে করতে চাইলে তিনি তার নাক কেটে দেন বলে এ জায়গার নাম নাসিক। নাসিকে বৌদ্ধগুহা আছে তেইশটি। প্রথম দিকের বৌদ্ধরা মূর্তি তৈরি করতেন না, পরের গুহাগুলিতে মূর্তি রয়েছে। সময়ের অভাবে লোকে মাত্র তিনটি গুহা দেখে। গৌতমীপুত্র ও নাগপাশ বিহারে রয়েছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শিলালিপি।

জুনাগড়—গুজরাটের জুনাগড়ে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ সবারই

স্মৃতিচিহ্ন রয়েছে। বিশাল একখণ্ড পাথরে রয়েছে পালি ভাষায় লেখা সম্রাট অশোকের চোদ্দটি অনুশাসন। অতীতে এখানেই ছিল উপরকোট বিহার। হিউয়েন সাঙ যখন এসেছিলেন তখন তিন হাজার স্থবির এখানে থাকতেন। বৌদ্ধ সাধুদের শুধু লামা বলা হয় না। তাঁদের অনেকে স্থবির,অনেকে আবার থের। স্থবির থেকেও থের হতে পারে,তবে লামা ও থের দুই সম্প্রদায়ের ব্যক্তি। নেপাল-ভুটান-তিব্বত-চীনে 'লা' ও 'লাম' শব্দদুটি পথ সম্বন্ধে ব্যবহার করা হয়, যিনি পথপ্রদর্শক তাঁকে বলা হয় লামা। খাপরা-খোদিয়া গুহা তিনটির একটিকে বলা হয় খঞ্জরমহল। জুনাগড়ের গিরনার পর্বতের ওপরে খুব বড় জৈন তীর্থ রয়েছে।

জুনাগড়ের কাছে আরও কয়েকটা বৌদ্ধ গুহা উৎসাহ নিয়ে না দেখতে গেলে অনেকেরই দেখা হয় না। যেমন ধানকে আছে চারটি গুহা ও একটি স্তম্ভ; সিদ্ধসরে রয়েছে ঝিনঝার ঝু গুহা। তালাহায় রয়েছে ৩৬টা গুহা ও একটা সরোবর। সবচেয়ে বড় গুহাটার নাম এভালমণ্ডপ, একটা গুহায় আছে মন্দির বা দাগোবা। কিন্তু কোন মূর্তি নেই। গুহাগুলোর সাদাসিধে ভাব দেখে মনে হয়, এগুলো খুবই পুরনো,হয়তো সম্রাট অশোকের সমসাময়িক। সানা-তে আছে ৬২টি গুহা, বড়টির ভেতরে ৬টি স্তম্ভ। এসব গুহায় বৌদ্ধ সাধুরা থাকতেন কিন্তু সাদামাঠা বলে এখন আর কেউ দেখতে যায় না। বল্লভীর একসময় খুব নাম ছিল বড় শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে। হিউয়েন সাঙ দেখেছিলেন ৬০০০ উপাসক এখানে রয়েছেন, বুদ্ধবিহার ছিল গোটা পনেরো। অনেক তাম্রফলক পড়ে ছিল এখানে। দুর্ভাগ্যক্রমে বল্লভী এখন ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। সিন্ধুর কামগিল্য বিহারেরও একই দশা।

বাগ—মধ্যপ্রদেশের বাগ গুহার অবস্থাও ভালো নয়। অজন্তার পরে প্রায় একই পদ্ধতিতে বাগ গুহায় ছবি আঁকা হয়। নটার মধ্যে পাঁচটা গুহা এখনও ভালো আছে। এদের মধ্যে রঙমণ্ডপ গুহাটি নিশ্চয় দেখা উচিত। বাগ নদীর ওপরে বিন্ধ্যপর্বতের পাহাড় কেটে এ গুহাগুলো তৈরি হয়।

অনন্তশয়নগুডি—অন্ধ্রের গুন্টুর জেলার এই গুহাটি প্রথমে বৌদ্ধগুহা ছিল বলেই পুরাতত্ত্ববিদেরা মনে করেন। পরে এদের ব্রাহ্মণ গুহায় পরিণত করা হয়েছে। এরকম গুহা অন্ধ্রপ্রদেশে আরো আছে।

কানহেরি গুহা—বোম্বাইয়ের খুব কাছে জাতীয় উদ্যানের মধ্যেই রয়েছে

কানহেরি গুহা। খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে নবম শতকের মধ্যে গুহাগুলো তৈরি হয়েছে। ১০৯টি বৌদ্ধ চৈত্য ও বিহার আছে এখানে। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কেটে গুহাগুলো তৈরি করা হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়। ভারী সুন্দর। কিন্তু গুহাও কম নয়, একশোটা। কোনটা আধভাঙা, কোনটার কাজ শেষ হয়নি। সবকটা গুহা খুব উৎসাহী ব্যক্তি ছাড়া কেউ দেখেন না। দেখতে দেখতে মনে হয়, কতদিন ধরে বৌদ্ধ সাধুরা এসব তৈরি করেছিলেন আর আমরা শুধু চোখ বুলিয়ে দেখারও সময় পাচ্ছি না। ৩ নং, ১১ নং ও ২৪ নং গুহার কাজ খুব সুন্দর ; ২৩ নং গুহায় চতুর্ভুজ বুদ্ধের এগারোটা মুখ, ৪১ নং গুহায় এগারোমুখী অবলোকিতেশ্বর রয়েছেন। এগারোটা মুখ কিন্তু সেই যাত্রার দলের রাবণ রাজার দুপাশে লাগানো মুখগুলোর মতো নয়। মাথার ওপরে টুপির মতো সাজানো, একটার ওপরে একটা। সুযোগ পেলে মন দিয়ে দেখো। জাতক কাহিনী আছে অধিকাংশ গুহার মধ্যে। ৫০ নং গুহায় সাপের মাথায় পদ্মাসীন বুদ্ধমূর্তি চোখে পড়বে।

কারলা ও ভাজা গুহা—মহারাষ্ট্রের কারলা ও ভাজা গুহা সেই প্রাচীনকাল থেকে দর্শকদের মুগ্ধ করছে। কারলা গুহায় যে চৈত্য তৈরি হয়েছে সেটি খ্রীস্ট-পূর্ব ১৬০ বছরে তৈরি হয়েছিল। কারলার বৌদ্ধ চৈত্যটি নাকি সবচেয়ে বড়। হীনযানপন্থীরা গুহাটি তৈরি করেন। ঘরটি ৪৫ মিটার লম্বা, ১৫ মিটার চওড়া আর উঁচু ১৬ মিটার। ৩৭টি স্তম্ভ আছে গুহায়, প্রতিটি বেশ কারুকাজ করা। বৈজয়ন্তীর ব্যবসায়ী বটুপাল গুহাটি তৈরি করিয়েছিলেন।

কারলার কাছেই ভাজা গুহা। ১৮টা গুহা আছে এখানে। এর মধ্যে ১২ নং গুহাটা খুব সুন্দর। এখানে সেকালের সাধারণ মানুষের মূর্তি খোদাই করা আছে কারলার মতো।

বেডসা গুহাও কাছেই। খুব সুন্দর কিন্তু প্রচার কম বলে অনেকেই দেখতে আসেন না। মানুষ, পশু, বিশেষ করে ঘোড়া ও হাতির মূর্তি আছে। একসময় যে ছবিও ছিল দেওয়ালে তার অস্পষ্ট আভাস চোখে পড়বে।

পিতলখোরার বৌদ্ধগুহায় আছে সাতটা ছবি আর যে বৌদ্ধ সাধুরা ছবি আঁকবার জন্যে টাকা দিয়েছিলেন তাঁদের নাম।

কোনডানের গুহা তৈরি হয়েছে ভাজার কিছুদিন পরে। স্তম্ভ তৈরি করা হয়েছে পাথর দিয়ে। গুহাস্থাপত্যে কোনডানে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গুহা।

জুনারের কাছে ১৩০টি গুহা আছে। গুহাগুলোকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। এত গুহা দেখে মনে হয় এককালে এখানে অনেক সন্ন্যাসী থাকতেন।

হয়তো বড় বৌদ্ধ মঠ ছিল। ছোট ছোট গুহাগুলো খুবই পুরনো যুগের।

কুড়ে রয়েছে একটি উল্লেখযোগ্য গুহা। কারহাদে ছোট বড় ষাটটি গুহা আছে, স্তম্ভ থাকলেও কোথাও কোন ভাস্কর্য বা মূর্তি নেই।

সেলাওয়ারদিতে আরও কিছু গুহা আছে। এগুলো থের ভদন্ত সীহার দুই শিষ্যা তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। একটা গুহা তৈরির খরচ দিয়েছিলেন একজন কৃষকের স্ত্রী।

কোনদিভিতে রয়েছে উনিশটি গুহা। সোলাপুর জেলার তার-এ রয়েছে অষ্টম শতাব্দীর একটি চৈত্য-হল। এখন অবশ্য এটা হিন্দুদের মন্দির হয়ে গেছে।

কোলহাপুরে গন্ধসাগর সরোবরের সামনে আছে একটি বুদ্ধমন্দির। ১১৮৮ সালে সিলাহারের রাজা গন্ধরাদিত্য এটি তৈরি করেন। এগুলো সবই আমাদের দেখা উচিত। যদিও আমরা প্রায় কেউই দেখি না। হয়তো দেখার মতো সুন্দর কোন শিল্পকর্মও এসব জায়গায় নেই। কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে তবেই বোঝা যায় বিশাল ভারতকে। সেই পুরনো যুগের বৌদ্ধ ভারতকে। আড়াই হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ সাধুরা যে সাধনা করছেন, তার প্রকৃত স্বরূপ তখনই যেন আমাদের চোখে ধরা পড়ে।

গোয়া—গোয়ায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভোজ রাজারা বৌদ্ধ বিহার তৈরি করেছিলেন। গোয়ার মুসির গ্রামে রয়েছে বুদ্ধমূর্তি। তবে গোয়ায় বৌদ্ধ বিহার বা মন্দির খুব উল্লেখযোগ্য নয়।

দাম্বল—কর্নাটক রাজ্যের ধারোয়ার জেলার দাম্বলে ১১শ শতাব্দীতে বেশ বড়ো গোছের বৌদ্ধবিহার গড়ে উঠেছিল। দাম্বলের ষোলো জন বণিক বা শ্রেষ্ঠী ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের রানী লক্ষ্মীদেবীর শাসনকালে বিহারটি তৈরি করেন। বৌদ্ধ দেবী তারার একাধিক মন্দির আছে এখানে।

কাঞ্চীপুরম—মাদ্রাজে গেলে সবাই কাঞ্চীপুরমের সুন্দর সুন্দর মন্দির দেখতে যায়। এ মন্দিরগুলো শিব ও বিষ্ণু মন্দির। কৈলাসনাথ বা বৈকুণ্ঠ পেরুমলের মন্দির। কিন্তু কাঞ্চীতে রয়েছে বৌদ্ধদের রাজবিহার, পাঁচটি বুদ্ধমূর্তি সমেত একশোটি মঠ। সাধারণত এগুলি দেখতে কেউ যায় না। একসময় কাঞ্চী বৌদ্ধ ধর্মচর্চার বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল।

হেমিস গুম্ফা—এবার চলে আসি উত্তরে। লাডাখে অনেকগুলো বৌদ্ধগুম্ফা

আছে। এগুলো অবশ্য মধ্য বা দক্ষিণ ভারতের মতো পুরনো নয়। লাডাখের সর্বত্রই রয়েছে অজস্র গুম্ফা। এরকম গুম্ফা আছে তিব্বতে, ভুটানে ও বৌদ্ধপ্রধান দেশে। সব দেশে তো আমাদের সবার যাবার উপায় নেই,তবে লাডাখে যাওয়া যায়। এখানকার সবচেয়ে বড়ো গুহা হল হেমিস গুম্ফা। এখানেই আছে বৃহত্তম থংকা বা কাপড়ে আঁকা ছবি। প্রতি এগারো বছর অন্তর এটি দর্শকদের দেখানো হয়। সে বছর খুব ভিড় হয় হেমিসে। ১৯৯১ সালে এটি দেখানো হবে, জুন মাসে। এই গুম্ফায় তিব্বতের প্রধান লামার মূর্তি আছে, তাঁর এক হাজার মুখ ও এক হাজার হাত। বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে এঁদের যে কোথায় যোগ আছে কে জানে ?

পথে বা আশেপাশে আরো কয়েকটা গোম্ফা আছে যেমন পাহাড়ের চূড়ার ওপরে থিকসে গোম্ফা, শ্যে গোম্ফা, শঙ্কর গোম্ফা ও স্পিটাক গোম্ফা।' শঙ্কর গোম্ফায় অসংখ্য সোনার মূর্তি ও মূল্যবান ছবির সংগ্রহ আছে। শ্যে-তে আছে একটি বিশাল বুদ্ধমূর্তি। স্পিটাক গোম্ফায় রয়েছে বিশাল কালীমূর্তি। এছাড়া আছে ফিয়াং গোম্ফা, লিকিং গোম্ফা, আলচি গোম্ফা ও লামায়ুরু গোম্ফা। আলচি-তে আছে ২০ ফুট উঁচু অবলোকিতেশ্বর। লাডাখের সবচেয়ে পুরনো গোম্ফা লামায়ুরু। মুলবেক গোম্ফায় আছে পাহাড় কেটে তৈরি করা মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব। এসব জায়গায় বুদ্ধদেবের চেয়েও বোধিসত্ত্বরাই বেশি পুজো পান।

সিকিম—সিকিমেও বৌদ্ধ গোম্ফা রয়েছে। এদের ধরনটা লাডাখেরই মতো। গ্যাংটক শহরে ঢোকবার মুখে নতুন গোম্ফা ছাড়াও রয়েছে রামটেক গোম্ফা। তিব্বতের আসল গোম্ফার নকল এটি। নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে উৎসব হয়। এছাড়া আছে টসিডিং গোম্ফা। পেমিয়াং শি থেকে হেঁটে যেতে হয়। বৌদ্ধদের কাছে এই গোম্ফাটি খুব পবিত্র। পেমিয়াং শি-তেও খুব পুরনো গোম্ফা রয়েছে। সিকিমের দিকে গেলে এ তিনটি গোম্ফা দেখে নেওয়াই ভালো।

দার্জিলিং—এবার এসো পশ্চিমবঙ্গে। শোনা যায়, পাল রাজাদের সময়ে বঙ্গদেশে খুব বড়ো বৌদ্ধ অনুশীলন কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধুরা এদেশে থাকতেন, ছবি আঁকতেন, কবিতা লিখতেন। বাংলার মাটি দু চার হাত খুঁড়লেই পাওয়া যায় বুদ্ধমূর্তি। অথচ বৌদ্ধ স্থাপত্যের কোন নিদর্শন এদেশে নেই বললেই চলে। এক সময়ে পাহাড়পুরে বিশাল স্তূপ ছিল,এখন তার ধ্বংসাবশেষ আছে বাংলাদেশে।

পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিংয়ে আছে ঘুম মনস্টারি বা গোম্ফা। বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু

রেল স্টেশন হল ঘুম। এখানে তিব্বতী গোম্ফায় ১৫ ফুট উঁচু মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব রয়েছেন। এছাড়া আছে দার্জিলিংয়ের আলুবাড়ি মনস্টারি, কালিম্পং-এর তিব্বতী মনস্টারি। এদের সঙ্গে মন্দির, গোম্ফা বা প্যাগোডার কোন তফাৎ নেই। তবে দার্জিলিং অঞ্চলে এদের মনস্টারি বলা হয়। ঘুম মনস্টারিতে খুব সুন্দর ছবি আঁকা আছে চারদিকে।

অরুণাচল—অরুণাচলের বিজয়নগরকে বৌদ্ধসংস্কৃতির পীঠস্থান বলেন অনেকে। বর্মা থেকে খামতি ও সিংফো সম্প্রদায় এসে বৌদ্ধ ধর্মকেন্দ্র গড়ে তোলেন। বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহারও আছে।

শিবসাগর—আসামের শিবসাগরে পুরনো দিনের অনেক কিছু দেখার আছে বিশেষ করে আহোম রাজাদের স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু এর কাছে আছে সামগাঁও। সেখানে থাকেন সিয়ামী বৌদ্ধরা। ছোট একটি মঠ আছে সেখানে। পেতলের বুদ্ধমূর্তি। এঁদের বাড়িঘর এবং ভাষাতেও শ্যাম দেশের ছাপ পড়েছে। গ্রামটি দেখতে খুব ভালো লাগে বলেই এর নাম করলুম। থাইল্যাণ্ড থেকে কেউ এদেশে বেড়াতে এলে তিনি কিন্তু এই নাম-না-জানা গ্রামটিতে ঠিক এসে ঘুরে যান, সামগাঁওয়ের বৌদ্ধরা যান সেখানে। স্বদেশ ও স্বজাতির ওপর টান যাবে কোথায় ?

ত্রিপুরা—আগরতলার কাছে পিলকে ৮ম থেকে ১০ম শতাব্দীর বৌদ্ধ স্থাপত্যের কিছু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। ত্রিপুরায় বৌদ্ধ স্মৃতিচিহ্নগুলোকে সযত্নে শিবমূর্তিতে বদলে দেওয়া হয়েছে। চতুর্দশদেবতা বাড়িতে শিব ও বুদ্ধ একই সঙ্গে রয়েছেন সারা বছর। আর উনকুটিতে রয়েছে শিব ও অন্যান্য দেবতা। কিন্তু ৪৫ মিটার উঁচু পাহাড় কেটে যে দেব মন্দির তৈরি হয়েছিল তাকে বৌদ্ধ মন্দির বলেই মনে হয়। পরে হয়তো হিন্দুরা মন্দির তৈরি করেছিলেন।

মোটামুটিভাবে এই হল আমাদের দেশের বৌদ্ধ স্থাপত্য ও মন্দিরের পরিচয়। ছোটখাটো আরও কিছু জায়গা ছাড়াও আছে নতুনভাবে গড়ে ওঠা মন্দির বা প্যাগোডা কিংবা স্তূপ। ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের জোয়ার চলে গেলেও বহু বিদেশী প্রতিষ্ঠান ভারতে বৌদ্ধ মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন। যেমন ধরা যাক ভুবনেশ্বরের কাছে ধৌলী গোম্ফা। সম্রাট অশোক এখানেই প্রতিজ্ঞা করেন 'আর যুদ্ধ করব না।' সম্রাটের আজ্ঞা আজও খোদিত থাকলেও ধৌলী

নতুন করে তৈরি করেছেন জাপানীরা। সারনাথ, কুশীনগর, বুদ্ধগয়া ছাড়াও বহির্ভারতীয় বৌদ্ধরা এখানে অনেক মন্দির ও প্যাগোডা তৈরি করিয়েছেন। এই কলকাতা শহরেও আছে কয়েকটা। কলেজ স্ট্রীটের মহাবোধি সোসাইটি ছাড়াও আছে তিন-চারটি মন্দির। কিন্তু সবচেয়ে ভালো বুদ্ধমূর্তির সংগ্রহ আছে কলকাতার জাদুঘরে। এক সময় ভারতই বৌদ্ধ ধর্ম ও স্থাপত্যের পীঠস্থান হলেও এখন সমস্ত এশিয়া জুড়ে ছড়িয়ে আছেন বৌদ্ধরা, তৈরি করেছেন অজস্র মঠ, মন্দির, প্যাগোডা, দাগোবা, স্তূপ এবং অবশ্যই বুদ্ধমূর্তি। এখন আর বুদ্ধমূর্তি তৈরি করা কঠিন ব্যাপার নয়, কারণ সকলেই মনে মনে জানে বুদ্ধদেব কেমন দেখতে ছিলেন।

বাংলাভাষা ও সাহিত্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করে চিত্রা দেব মধ্যযুগের এক অনাবিষ্কৃত মহাভারতের ওপরে গবেষণা করে ডক্টরেট পেয়েছেন। কবিচন্দ্রের মহাভারত, বিষ্ণুপুরী রামায়ণ, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল ও ময়ূরভট্টের ধর্মমঙ্গল সম্পাদনা করেছেন একক ও যৌথভাবে। বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তাঁর নিরন্তর গবেষণার উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি রয়েছে বিদগ্ধ মহলে। বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে লেখা তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'ঠাকুরবাড়ির অন্দর মহল' ও 'অন্তঃপুরের আত্মকথা'। এছাড়া রয়েছে কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলন। 'বিবাহ বাসরের কাব্যকথা,' 'পুঁথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা, 'শ্রীরামকৃষ্ণ সাহিত্যধারা ও অন্যান্য প্রবন্ধ'। অনুবাদ করেছেন প্রেমচন্দের হিন্দী উপন্যাস 'সেবাসদন,' 'গোদান' ও 'নির্মলা'। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার বিভাগের সঙ্গে যুক্ত।

প্রচ্ছদ অমিয় ভট্টাচার্য